# প্রবাস-প্রসূন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

# প্রবাস-প্রসূন।

## কতিপয় পৌরাণিক স্থানের ইতিহাস।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

পুরুলিয়া
অন্নপূর্ণা প্রেসে
শ্রীকালিচরণ ত্রিবেদী দ্বারা
মুদ্রিত।

গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত।

১৩২২।

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

সুহৃদ্বর—
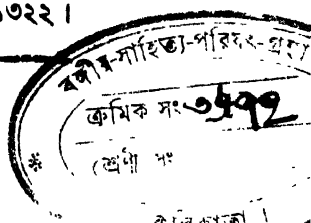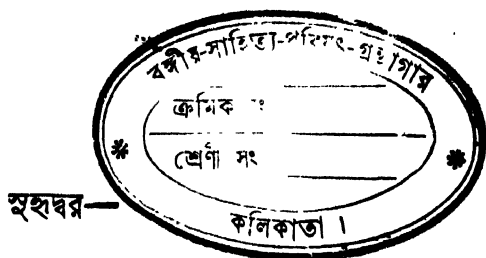
শ্রীমান সতীশচন্দ্র সিংহের

কর কমলে

স্নেহোপহার

স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তক

অর্পিত হইল।

পুরুলিয়া
তারিখ ২০শে অগ্রহায়ণ,
১৩২২।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র।

# ভূমিকা।

ইতিহাস জ্ঞানলাভের একটী প্রকৃষ্ট পথ—ভিন্ন ভিন্ন দেশ, সমাজ ও ব্যক্তির ইতিহাস হইতে বহুবিধ জ্ঞানলাভ করা যায়। যে কয়েকটি স্থানের বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম তাহাদের প্রত্যেকটীই পৌরাণিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান ও বহু প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। প্রত্যেক পাঠক পাঠিকার জ্ঞাতব্য জিনিষ। এরূপ ইতিহাস প্রণয়নে যেরূপ বিস্তৃত জ্ঞান ও বিদ্যার আবশ্যক, আমার সে বিষয়ে যথেষ্ট অভাব। সুতরাং এই পুস্তকে বহুল ত্রুটি বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নয়। তজ্জন্য আমি পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পুরুলিয়া।
২০শে অগ্রহায়ণ,
১৩২২।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র।

১৭৭২

# প্রবাস-প্রসুন।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### হাওড়া হইতে জব্বলপুরের পথে।

দুর্গতিহারিণী মা দুর্গার শারদীয় পূজার বিজয়ান্তে মার চরণে প্রণিপাত এবং আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া ১৩১৯ সালের ৭ই কার্ত্তিক বুধবার রাত্রি ৯।৷০ ঘটিকার সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর বোম্বাই ডাকগাড়ীতে আমি ও পুরুলিয়ার (মানভূম) খ্যাতনামা সরকারী উকিল ও পঞ্চকোটাধিপতি মহারাজের আইন ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত রামচরণ সিংহ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সতিশচন্দ্র সিংহ আমরা উভয়ে হাওড়া হইতে জব্বলপুর রওনা

হইলাম। আমরা বাটী হইতে আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়াছি; রাত্রির জন্য এখন নিশ্চিন্ত। গাড়ীতে উঠিয়া দুজনে স্থান অধিকার করিয়া বেঞ্চের উপর নিজ নিজ শয্যা বিস্তার করিয়া ফেলিলাম। গাড়ি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাড়িয়া ছিল।

রাত্রিতে কোনও দিকে কিছু দেখা চলে না, কাজেই এখন শয়ন ব্যতীত অন্য কোনও কাজ নাই। আজ রাত্রি ৯৷৷০ টায় গাড়ীতে উঠিলাম, কাল সন্ধ্যা ৬ টায় জব্বলপুরে পৌছিব। এই নাতিদীর্ঘ সময়টুকু গাড়ীতে কাটাইতে হইবে। এখনকার মত ঘরকন্না গাড়ীতেই; সুতরাং জিনিষপত্রগুলি—ট্র্যাঙ্ক, ব্যাগ, জলের কুঁজা ইত্যাদি—বেশ গোছাল করিয়া রাখিলাম। দুজনে তারপর শয়ন করিয়া গল্প আরম্ভ করা গেল। গাড়ীব সেই একঘেয়ে আওয়াজ কানে ক্রমে যেন ঐক্যতান বাদ্যের সুরের মত হইয়া গেল; তাতে আর বিরক্তি এলো না। ডাকগাড়ীর গতি অতি দ্রুত। ক্রমে লিলুয়া, বালি, কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি ষ্টেশনগুলি একে একে নিমেষ মধ্যে ছাড়িয়া পার হইতে লাগিল। ঐ সকল ষ্টেশনের কোনটিতেই দাঁড়াইল না। এ সব ষ্টেশনের ঘরগুলি যেন দ্বীপ নির্ব্বাসিত বন্দীর জাহাজের গতি লক্ষ্য করিয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া তাকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকার ন্যায় আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। আমরা গল্পে অনন্যমনা ছিলাম। গাড়ী একেবারে বর্দ্ধমানে আসিয়া থামিল। ষ্টেশনের পোর্টারের “বরদোয়ান” “বরদোয়ান” রবে চিৎকারে আমাদের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। গাড়ী থামিবামাত্র ষ্টেশন প্লাট্‌ফরম লোকারণ্য

হইয়া উঠিল। আরোহীগণের কোলাহলে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমাদের বর্দ্ধমানে কোনও আবশ্যক ছিল না। গাড়ী হইতে মাথা বাড়াইয়া ষ্টেশনের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বর্দ্ধমান খুব বড় এবং বেশ সুসজ্জিত ষ্টেশন। তার উপর বৈদ্যুতিক আলোকে রাত্রিতে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখিতে দেখিতে দু চারি মিনিট মধ্যে যাহারা নামিবার তাহারা নামিয়া চলিয়া গেল এবং যাহারা উঠিবার তাহারা উঠিয়া বসিয়া পড়িল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী ছাড়িল; পূর্ব্ববৎ চলিতে আরম্ভ করিল। এমন চলিতেছে যেন আর থামিবে বলিয়া বোধ হয় না; একেবারে যেন কমা, ফুলষ্টপ্ আর নাই। আমরাও পূর্ব্ববৎ গল্প আরম্ভ করিলাম। ক্রমে রাত্রি হইতেছে। সতিশ ভায়া অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার নাসিকা উচ্চ নিচ তালে, বাঁধা স্বরে জলদ গম্ভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। আমিও অগত্যা নিদ্রা দেবীর চরণে স্মরণ লইলাম। এক ঘুমেই রাত্রি প্রভাত।

প্রাতঃকাল ৫টা বাজিয়াছে; উষার শেষে পূর্ব্বাকাশে অরুণ দেবের তরুণ কিরণ বৃক্ষ লতাদির উপর পতিত হইয়া সুবর্ণ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে; সবুজ পত্রসকল চক্‌মক্ করিতেছে; বিহঙ্গকুল যেন এই সময় ভাস্করের সহাস্য প্রফুল্ল বদনখানি দেখিবার জন্য কুলায় বাহিরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় আমরা গয়ায় পৌছিলাম। এখানে অল্প ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল। মুখ হাত ধুইয়া 'চা' পান করা গেল। কিয়ংক্ষণ

পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এইবার গাড়ীর জানালার পাশে বসিয়া আমরা নূতন দেশ দেখিতে লাগিলাম। বেলা ১২টার সময় "শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক" ষ্টেশনে পৌছিলাম। এখানে শোন নদের উপর সেতু বাঁধিয়া তাহার উপর দিয়া রেল পথ লইয়া গিয়াছে। শোন ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড নদ। নদের দুই পারে দুইটি জংসন্ ষ্টেশন। পূর্ব্বপারে "শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক" ষ্টেশন। এখান হইতে একটি শাখা রেলপথ বাহির হইয়া ডাল্টনগঞ্জ (পালামৌ) পর্য্যন্ত গিয়াছে। নদের পশ্চিম পারে "ডিহিরি অন শোন" ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে মার্টিন কোম্পানীর "হাওড়া—আমতা" রেলপথের মত ২ ফিট চওড়া একটি রেলপথ "অক্টেভাস্ ষ্টীল" কোম্পানী 'রোটাস' নামক স্থান পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। এই জায়গায় শোন নদের প্রসর সওয়া দুই মাইল। ১০০ ফুট লম্বা এরূপ ৯৩টি স্প্যান এই পুলে আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই সেতুটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়; এবং জগতে এইটি দ্বিতীয় সেতু বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্কটলণ্ডের "টে" নদির উপর যে সেতু তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়, এবং এটী তাহার পর।

ডাকগাড়ী 'শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক' ষ্টেশন পৌঁছিলে আমরা নামিয়া প্লাট্‌ফরমে একটু পদচারণা করিতে লাগিলাম। অনেক ভদ্রলোক, অনেক সাহেব, মেম বেড়াইতেছেন। কেহ 'চা' পান করিতেছেন, কেহ গল্প করিতেছেন। গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি এমন সময় সহসা আমার ভাগিনেয় হুগলী

দিলাকাস নিবাসী শ্রীমান প্রভাসচন্দ্র মল্লিক বি, এ, আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া মনে যে কি আনন্দ হইল বলিতে পারি না। সুদূর প্রবাস পর্য্যাটনে হঠাৎ একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে দেখিলে সকলেরই এরূপ আহ্লাদ হয়। তাহার পিতা ডিহিরিতে কার্য্য করেন। সে তাঁহার নিকট যাইতেছে। অতি অল্প সময়ই প্রভাসের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পাইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

## জব্বলপুর।

অক্লান্তগতিতে হুহু শব্দে ছুটিয়া নানা জনপদে আরোহী নামাইয়া এবং লইয়া ডাকগাড়ী পরদিন সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় জব্বলপুর পৌঁছিল। আমরা শুষ্ক কলেবরে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাদের জিনিষপত্র প্লাটফরমে নামান হইল। গত রাত্রিতে আমরা হাওড়া ষ্টেশনে বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া আজ সন্ধ্যার সময় কলিকাতা হইতে ৬১৬ মাইল দূর মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর সহরে উপস্থিত। ষ্টেশন হইতে এক মাইলদূর হাওবাগ নামক স্থানে আমাদের জনৈক বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারাণদাস দত্ত অবস্থান করেন। এখানে আজ আমরা তাঁহার অতিথি হইব। ষ্টেশনের বাহির দিকে শ্রেণীবদ্ধ টাঙ্গাগাড়ী সকল দাঁড়াইয়া আছে। টাঙ্গাগুলি অনেকটা ফিটনগাড়ীর মত। ফিটনের একদিকে বসিবার স্থান; টাঙ্গার সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুই দিকেই বসিতে পারা যায়, এই তফাৎ। সমস্ত মধ্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া এই টাঙ্গাগাড়ীর চলন।

আমরা আট আনায় একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া হাওবাগে নারাণ বাবুর বাসায় চলিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া নারাণ বাবুর প্রতিবেশী একজন পঞ্জাবি ওভারসিয়ার বাবুর নিকট শুনিলাম নারাণ বাবু বাসায় নাই, মফঃস্বলে গিয়াছেন; ফিরিতে রাত্রি ১০টা বাজিবে। ওভারসিয়ার বাবু আমাদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বসিতে দুইখানি চেয়ার দিলেন এবং মিষ্ট আলাপে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন, ও ইতিমধ্যে আমাদের জন্য দুইবাটী গরম 'চা' আনিতে বলিয়া দিলেন। রেলগাড়ীতে একাদিক্রমে বিশ ঘণ্টাকাল অবস্থান জনিত কষ্ট যে কি মধুর তাহা ভুক্তভোগিই বুঝেন। সে সময় আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল। একজন ভৃত্য দুইবাটি চা' আনিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। আমরা পান করিয়া যারপরনাই তৃপ্তিবোধ করিলাম। আমাদের শ্রান্তির অনেক উপশম হইল। পঞ্জাবপ্রদেশের লোক এত বিনয়ী এবং অতিথি-সৎকার-পরায়ণ, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। তাঁহার যত্নে আমরা মোহিত হইয়াছিলাম। আমাদের সহিত ইংরাজীতে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল—প্রত্যেক কথাটি তাঁর যেন বিনয়-মাখান। 'চা'পান সমাপান্তে আমরা নারাণ বাবুর বাসায় যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলাম। নারাণ বাবুর বাসাটি যদিও আমার জানা ছিল তথাপি সে সময় অন্ধকার জন্য চিনিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইবে বলিয়া ওভারসিয়ার বাবু একজন লোক আমাদের সঙ্গে দিলেন।

আমরা নারাণ বাবুর বাসায় পৌঁছিলে তাঁহার দাদা আমাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং আমাদের সুখসচ্ছন্দতার জন্য কত ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা জব্বলপুর সহর দেখিতে বাহির হইলাম। দুই ঘণ্টা সহরের এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্ত্তণ করিলাম। একটু পরে আহারাদি সমাধা হইল। এইবার নিদ্রাভিনয়ে মনঃসংযোগ করা গেল। এক অঙ্কেই নিশার যবনিকার পতন হইল। প্রাতে জব্বলপুরের মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড়, নর্ম্মদার জলপ্রপাত প্রভৃতি দেখিতে যাইতে হইবে, এই জন্য রাত্রেই টাঙ্গার বন্দবস্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে ৫টার সময় টাঙ্গাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া পোষাক পরিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে নারাণ বাবু গরম লুচি, মোহনভোগ ও 'চা' আনিয়া জলযোগের জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তখন ক্ষুধা ছিল না বলিয়া জলযোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাঁহাদের দুই ভ্রাতার অতিরিক্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কিছু খাইলাম এবং 'চা' পান করিলাম, ও অবশিষ্ট খাবার সমস্ত তাঁহারা আমাদের সঙ্গে দিলেন। ৬টার সময় আমাদের টাঙ্গা ছাড়িল।

টাঙ্গা পব্লিক ওয়ার্কসের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল। যেখানে মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় সে স্থানটিকে "ভেড়াঘাট" বলে; জব্বলপুর সহর হইতে ১৩ মাইল দূর। আমরা বেলা ৮টার সময়

ভেড়াঘাটে পৌঁছিলাম। ভেড়াঘাটের সন্নিকটে পথিমধ্যে একজন স্থানীয় প্রদর্শক পাণ্ডা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহার সার্টিফিকেট বহি আমাদিগকে দেখাইয়া সে একজন প্রদর্শক বলিয়া পরিচয় দিল। বহিখানি পড়িয়া বুঝিলাম সে একজন ঐ স্থানের অধিবাসী পাণ্ডা, নাম গঙ্গাপ্রসাদ। যাঁহারা ভেড়াঘাট দেখিতে যান তাঁহাদিগকে তাহারা সমস্ত দেখাইয়া থাকে—এই তাহাদের কার্য্য। আমরা নারাণ বাবুর নিকট জানিয়া ছিলাম ভেড়াঘাটে প্রদর্শক পাওয়া যায়, এবং দ্রষ্টব্য জিনিষ সমস্ত দেখিতে ও বুঝিতে আমাদের অসুবিধা হইবে না। আমরা গঙ্গাপ্রসাদকে প্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইমাম। আমাদের টাঙ্গা নর্ম্মদা নদীর সন্নিকটে এবং বানগঙ্গার তীরে এই উভয় নদীর সঙ্গম স্থলের অত্যল্প দূরেই, যেখানে পব্লিক ওয়ার্কসের বাঁধা রাস্তা শেষ হইয়াছে, সেখানে যাইয়া থামিল। এই পর্য্যন্ত টাঙ্গার শেষ পথ। এখান হইতে পদব্রজে দ্রষ্টব্য স্থানে যাইতে হয়।

টাঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া আমরা প্রদর্শক গঙ্গাপ্রসাদের অনুগমন করিতে লাগিলাম। আমাদিগকে বানগঙ্গা পার হইতে হইবে। তখন বানগঙ্গা শুষ্কপ্রায়; অভ্যন্তরে সামান্য—৫।৬ হাত ব্যবধান এবং একহাত গভীর—একটি স্রোত চলিতেছে মাত্র। আমরা নদীতে নামিলেই দুইটি কুলি আসিয়া আমাদিগকে কাঁধে করিয়া পার করিয়া দিল। বোধ হইল যেন পূর্ব্ব হইতে তাহারা ওখানে আমাদেরই জন্য নিযুক্ত ছিল। কুলিদ্বয়কে এক

আনা পয়সা পারিশ্রমিক দিয়া যথাক্রমে উচ্চ নিচ বালুকা এবং প্রস্তরময় সমতল ও উপত্যকাভূমি পার হইয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে চড়াইয়ে উঠিতে ও নামিতে হইল; তাহাতে পরিশ্রম বোধ হইতে লাগিল। সতিশ ভায়া অল্প কষ্টসহিষ্ণু; যেন কিছু বেশী কাতর হইতে লাগিলেন। কিন্তু ভ্রমণের আনন্দ জন্য সে কষ্ট বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না।

কতকদূর যাইয়া বামদিকে এক স্থানে লৌহার বেড়া দিয়া ঘেরা পাথর দিয়া বাঁধান দুইটি কবর দেখিলাম। নর্ম্মদার মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড়ের মধ্যে অনেক মধুমক্ষিকার চক্র আছে। প্রবাদ এইরূপ, সেই সকল মধুচক্রে ধুম লাগিলে মধুমক্ষিকাগণ ক্ষিপ্ত হইয়া বাহির হয়, এবং সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই সাংঘাতিকরূপে দংশন করে—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। বোডিংটন এবং সোডার নামক দুইটি ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক সেই মধুচক্রের নিকট যাইয়া বন্দুকের আওয়াজ করিয়াছিলেন; বন্দুকের ধুঁয়ায় ক্ষিপ্ত মৌমাছিকুল দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া সাহেবদ্বয়কে আক্রমণ করে। উপায়ান্তর না পাইয়া তাঁহারা নর্ম্মদার জলে ডুব দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুতেই তাঁহারা মধুমক্ষিকার ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। মধুমক্ষিকার করাল দংশনে অবশেষে নদীর জলেই তাঁহাদের প্রাণবিয়োগ হইল। উহাদেরই এই দুইটি কবর।

কবরস্থান পার হইয়া কতকদূর যাইয়া দ্রুতগামী রেল-গাড়ীর আওয়াজের মত আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, এবং অনতিবিলম্বেই দেখিলাম যে দিক হইতে আওয়াজ আসিতেছে

সেই দিকে অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া স্তম্ভাকারে ঘন ধপধপে সাদা ধুঁয়া একস্থান হইতে উঠিয়া ক্রমে শূন্যে বাতাসে মিলিয়া যাইতেছে। যতই আমরা অগ্রসর হইতেছি শব্দ ততই গভীর এবং স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। গঙ্গাপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ শব্দ নর্ম্মদার জলপ্রপাতের, এবং ধুঁয়া প্রপাতের পতিত জল হইতে উঠিতেছে। শুনিয়া আমাদের কৌতুহল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে আমরা নর্ম্মদার কুলে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে জলপ্রপাত আমাদের সম্মুখে ২৪ গজ আন্দাজ তফাৎ হইবে। জলপ্রপাতের জল তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিতেছি, কিন্তু নিম্নে যে স্থানে পতিত হইয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহা এখান হইতে দেখা যায় না। নর্ম্মদার অভ্যন্তর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রস্তরময়। স্থানে স্থানে প্রস্তরের মাঝে সরুধারে অনেকগুলি স্রোত বহিতেছে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র স্রোতগুলি পার হইয়া একবারে জলপ্রপাতের অব্যবহিত পার্শ্বে যাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি স্রোত কিছু বেশী প্রশস্ত; লাফাইয়া পার হওয়া দুরুহ; এজন্য একজন লোক সেখানে একখানি তক্তা পাতিয়া সাঁকোর মত করিয়া বসিয়া আছে। আমরা প্রাত্যকে অর্দ্ধ আনা পয়সা তাহাকে দিয়া পার হইয়া জলপ্রপাতের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অভূতপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়। লেখনী বা বাক্য সে দৃশ্যের চিত্র অঙ্কন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সে চিত্রের অনুরূপ জ্ঞানে কথনও দেখি নাই এবং দেখিব বলিয়াও মনে হয়

না। বহুদূর পূর্ব্বদিক হইতে নর্ম্মদার প্রস্তরময় বক্ষ বাহিয়া বিচ্ছিন্ন উর্ম্মিমালা সকল প্রপাতের নিকটে আসিয়া একত্রে দলবদ্ধ হইয়া একটি প্রকাণ্ড স্রোতে পরিণত হইয়া, দিগন্তব্যাপী গম্ভীর কলনিনাদে মহান বেগে দুইশত ফিট নিম্নে এক জায়গায় পাথরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। এইরূপে নির-বচ্ছিন্ন জলের উপর জল পতিত হইয়া পরস্পর প্রতিঘাতে উচ্ছলিত দুগ্ধফেননিভ শুভ্র জল-বিম্ব সমূহ উড্ডিয়মান কার্পাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুক্‌রার ন্যায় ফেনাকারে উর্দ্ধে উঠিয়া বাতাসে মিলিয়া যাইতেছে। সে দৃশ্য প্রকৃত অভিনব; সে দৃশ্য যে কি রকম চিত্তাকর্ষক যিনি দেখিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা পার্শ্ববর্ত্তী শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে অবলোকন করিতে করিতে যেন তন্ময় হইয়া যাইলাম। উঠিতে ইচ্ছা হয় না। উচ্ছলিত জলের আঘাত স্রোতের দুই পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্তরের গায়ে লাগিয়া কোথাও লাল, কোথাও নীল, কোথাও পীত এবং কোথাও রামধনুবর্ণ প্রতিফলিত হইতেছে।

প্রপাতের অত্যল্প দূরে একটি অপেক্ষাকৃত ছোট শাখা স্রোতের উপর কোনও সওদাগর আটা প্রস্তুতের কল বসাইতেছে দেখিলাম। ষ্টীমের পরিবর্ত্তে স্রোতের সাহায্যে কলের চাকা ঘুরিয়া জাঁতা চলিবে। ইহার অনুরূপ ইহাপেক্ষা বৃহদাকারের কল নাসিকে গোদাবরী নদীতে দেখিয়াছি। নাসিক পরিচ্ছেদে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিব। নর্ম্মদার কূলে এক জায়গায় শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর মাপ করিয়া কাটিতেছে দেখিলাম।

## সাবান পাথর।

যে পথে জলপ্রপাতে পৌঁছিয়াছিলাম সেই পথ দিয়া আন্দাজ এক মাইল ফিরিয়া আসিয়া এক জায়গায় সাবান পাথরের খাদ দেখিলাম। খাদটি তখন জলে পূর্ণ থাকায় কিছুই দেখা হইল না; কেবল খাদের উপর দু চারিখানি সাবান পাথর দেখিতে পাইলাম। এই খাদের স্বত্বাধিকারী বরণ কোম্পানী। সাবান পাথরের রং সাদা; হাতে করিয়া চাপ দিলে সহজেই গুঁড়া হইয়া যায় ও হাতে হড় হড় করে।

## চৌষট্টী যোগিনী ও গৌরিশঙ্কর।

সাবান পাথরের খাদ হইতে প্রায় পশ্চিম মুখে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে একটি বিভিন্ন শুঁড়িপথ দিয়া গঙ্গাপ্রসাদ আমাদিগকে লইয়া চলিল। এ পথটি চৌষট্টি যোগিনীর পাহাড়ে গিয়া লাগিয়াছে। ইহা এত সঙ্কীর্ণ পথ যে স্থানে স্থানে বৃক্ষ লতায় অবরুদ্ধ করিয়াছে। লতাগুল্ম সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে চলিতে হইল। এই আঁকা বাঁকা বন্য পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় আধ ঘণ্টার পর চৌষট্টি যোগিনীর পাহাড়ের পাদদেশে আমরা উপনীত হইলাম। নিম্ন হইতে পাহাড়ের উপরিস্থ মন্দিরের প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত উঠিবার একটি চালু পথ আছে। আমরা সেই পথে উঠিতে লাগিলাম। আবার সেই বানগঙ্গার চড়াইএ উঠিবার মত মেহনত, আবার সেই রকম ঘর্ম্মাক্ত কলেবর—বরং এবার তাহাপেক্ষা বেশী, কারণ এর চড়াই অপেক্ষাকৃত অধিক খাড়া। যাহা হউক কষ্টে শ্রেষ্টে প্রাচীরের

দ্বারদেশে পৌঁছিলাম। সমতল হইতে প্রাচীর পর্য্যন্ত পাহাড়ের উচ্চতা দেড়শত ফিটের কম নয়। গঙ্গাপ্রসাদ প্রমুখ আমরা মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। জুতা ত্যাগ করিয়া প্রথমে গৌরী-শঙ্কর দেখিতে যাইলাম। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে মন্দির; মন্দিরের মধ্যে ভূতভাবন মহাদেব ও জগৎতারিণী শঙ্করীর কাল মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত আপাদমস্তক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। মূর্ত্তি এত উজ্জ্বল দেখিলে মনে হয় যেন অতি অল্পদিন প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সময় একজন পূজক ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া দেবদেবীর বেশভূষা করাইতেছেন দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখস্থ দ্বার হইতে সংলগ্ন আন্দাজ ৩০ ফুট দীর্ঘ, ১৫ ফুট প্রশস্ত, থাম ও ছাদওয়ালা চারিদিক খোলা একটি বারান্দা আছে। লোকজন সেখানে বিশ্রাম করিতে পারে। দুই আনা দিয়া আমরা প্রণাম করিলাম। গৌরীশঙ্করের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে ১২ হাত আন্দাজ চওড়া প্রাঙ্গন এবং প্রাঙ্গনের পর গোলাকার প্রাচীর; প্রাচীরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকে দুই প্রবেশ দ্বার; প্রাচীরের ভিতর গায়ে ৪ হাত আন্দাজ চওড়া ছাদওয়ালা এক টানা বারান্দা এবং সেই বারান্দায় মেটে রংএর পাথরের সারি সারি চৌষট্টিটি—দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি—দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি উচ্চতায় ৪ ফুটের কম নয়। সবই প্রায় ভাঙ্গা। কাহারও হাত, কাহারও নাক, কাহারও কান, কাহারও মাথা ভাঙ্গা। প্রবাদ, হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী সম্রাট আরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

এই মূর্ত্তিগুলির নাম চৌষট্টি যোগিনী কেন হইল, বা ইহাদের প্রকৃত ইতিহাস কি, তাহা পাওয়া সুকঠিন। স্থানীয় লোকে এবং পাণ্ডারা অনেক রকম গল্প বলিয়া থাকে। ফলতঃ ইহা যে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বের এবং বহু প্রাচীন কোনও হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইলাম। পশ্চিম দ্বারের বাহিরে সম্মুখেই বামপার্শ্বে চারি বর্গহাত আন্দাজ চতুষ্কোণ একটি বাঁধান গহ্বর একখণ্ড কাষ্ঠফলক দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। শুনিলাম ইহা একটি সুড়ঙ্গের দ্বার। ঐ সুড়ঙ্গ দিয়া পূর্ব্বে ৫।৬ মাইল দূর পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত। এখন তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাহাড়ের পশ্চিমদিকের পথটি পূর্ব্বদিকের মত নয়—বরাবর নিম্ন পর্য্যন্ত পাথরের প্রশস্ত সোপান দ্বারা বাঁধান। সোপান দেখিয়া নামিবার পূর্ব্বে আমাদের মনে হইয়াছিল উঠিবার মত নামিতে আর কষ্ট হইবে না। কিন্তু কিয়দ্দূর নামিয়াই বুঝিতে পারিলাম সে ধারণা ভুল; সোপান বাহিয়াই হউক আর ঢালু জায়গা দিয়াই হউক পাহাড়ে নামা ও উঠা উভয়ই কষ্ট সমান। পাহাড়ে উঠিবার সময় সমস্ত শরীরের ভারটি যেমন পায়ের উপর জোর দিয়া সম্মুখে টানিয়া তুলিতে হয়, নামিবার সময় সেই রকম শরীরের জোরে পদদ্বয়কে পাছু দিকে টানিয়া রাখিতে হয়; নতুবা সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

চৌষট্টি যোগিনীর পাহাড়ের পশ্চিম পথে নামিয়া আমরা একটি প্রশস্ত রাজপথে উপনীত হইলাম। পথটি পশ্চিমদিকে ধর্ম্মশালার সম্মুখ হইয়া নর্ম্মদার পঞ্চবটী ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে

সারি সারি অনেকগুলি খোলার ঘর। এইস্থানে ইহা একটি ছোট-খাট পল্লী। পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়াদেখিলাম ঐ পথের ধারে এক জায়গায় এক বৃক্ষতলে কতকগুলি লোক নানাবর্ণের পাথরের খেলনা, কাগজ চাপা ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছে। আমরা সেখান হইতে তাহার কিছু কিছু খরিদ করিলাম। তারপর ঐ পথ ধরিয়া বরাবর নর্ম্মদার পঞ্চবটী ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইবার মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড় দেখিতে যাইবার পালা।

## শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের পাহাড়।

ঘাটে লোক্যাল বোর্ডের ছোট বোট ৪।৫ খানি বাঁধা আছে। বোটগুলি দেখিতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাদা রং মাখান। প্রত্যেক বোটে মাঝির সম্মুখে লম্বালম্বি বোটের দুই পার্শ্বে দুইখানি গদি আঁটা বেঞ্চ লাগান আছে; প্রত্যেক বেঞ্চে তিন জন করিয়া বসিতে পারে। আমরা একখানি বোটে উঠিয়া বেঞ্চে উপবেশন করিলাম। বোটের ভাড়া ইত্যাদি পূর্ব্ব হইতে আমাদের জানা ছিল। বসিবার পর মাঝি লোক্যাল বোর্ডের মোহরযুক্ত একখানি কেতাব আমাদের সম্মুখে ধরিল। কেতাব-খানি আর কিছুই নয়—মর্ম্মর পাহাড় দেখিতে যাইতে বোটের ভাড়া প্রত্যেক আরোহী ১॥০ টাকা হিসাবে দিবেন এবং মাঝি ও দাঁড়ি ৩ জনের মজুরি প্রত্যেকের দুই আনা হিসাবে স্বতন্ত্র প্রাপ্য ইত্যাদি নিয়মাবলী ইংরাজীতে লেখা আছে। গঙ্গাপ্রসাদও আমাদের সঙ্গে বোটে উঠিয়াছে। যদিও কোথাও গঙ্গাপ্রসাদের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাই, পাঠক! মনে

করিবেন না গঙ্গাপ্রসাদকে আমরা ত্যাগ করিয়াছি বা গঙ্গাপ্রসাদ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে। গঙ্গাপ্রসাদ বরাবর আমাদের সঙ্গে আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। সে নানা রকম গল্প বলিতে বলিতে পথ চলিতেছে ; আমরা কতক শুনিতেছি, কতক ডিস্কাউণ্ট হিসাবে বাদ দিতেছি। মাঝে মাঝে সে আমাদিগকে তোয়াজ করিতেছে। ডাকবাঙ্গালোর নিকটে আসিয়া আমাকে 'চা' পান করিবার লোভ দেখাইয়া একটু মনরঞ্জন করিল। কি জানি গঙ্গাপ্রসাদ বুঝি কেমন করিয়া বুঝিয়াছিল, 'চা' ডাক্তার বাবুর বড় প্রিয় বস্তু এবং হয়ত ভাবিয়াছিল 'চা' পানের কথা বলিলে ভাল বকসিস মিলিবে।

বোটে করিয়া যাইতে হইবে শুনিয়া অবধি আমার মনে চিন্তার স্রোত চলিতেছিল ; কেন না আমার সাঁতার শিক্ষা নাই। একদিকে জলমগ্ন হইয়া ডুবিয়া মরিবার ভয়, অন্যদিকে এক অভিনব দৃশ্য দেখিয়া চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করা। দুর্গানাম স্মরণ করিয়া বোটে উঠিয়াছি। বোট ছাড়িয়া দিল। মর্ম্মর পাহাড় অভিমুখীন নর্ম্মদার অংশের মূর্ত্তি এ সময় প্রশান্ত ছিল। মাঝিদের আশ্বাস বাক্যে না হউক, নদীর স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া অন্ততঃ মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল। মৃদু মন্দ গতিতে বোটখানি মর্ম্মর পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অদূরে নর্ম্মদার দুই তীরে নদীগর্ভ হইতে উত্থিত অত্যুচ্চ অভ্রভেদী মর্ম্মর শৈলের শোভা ক্রমে আমাদের নয়ন-পথে পতিত হইতে লাগিল। শোভা সন্দর্শন করিয়া প্রাণ পুলকে পুরিয়া গেল।

যতই নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, দৃশ্য অধিক হইতে অধিকতর মনোরম বোধ হইতে লাগিল। সে শোভা যে কিরূপ চিত্তাকর্ষক, সে শোভার তুলনা কি এবং তাহার স্থষ্টিকর্ত্তা কে এ সমস্ত আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। শুভ্র জ্যোৎস্না আলোকে এ দৃশ্য আরও অধিক নয়ন রঞ্জক। নদীর দুই কূলে শুভ্র-কান্তি মর্ম্মর গিরিরাজ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান; এবং মধ্যস্থলে নর্ম্মদার প্রশান্ত স্বচ্ছ নিলাম্বু। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদা সলিল সিঞ্চনে সর্ব্বদা যেন গিরিরাজের অঙ্গ ধৌত করিতেছেন। বিধাতার বিচিত্র কারুকার্য্য অবলোকণ করিতে করিতে আমরা ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে দুই একটি মর্ম্মরপ্রস্তরের দ্বীপ দেখিলাম। একটি দ্বীপে একটি কুণ্ড আছে; সে কুণ্ডতে কোনও মুনি হোম করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। একটি দ্বীপে বিস্তর সোয়ালো পক্ষীর বাসা আছে এবং সেই স্থানে অনেক সোয়ালো পক্ষী উড়িতেছে দেখিলাম।

একটু পরে পাহাড়ের খুব উচ্চ স্থানে এক জায়গায় মধুমক্ষিকার বিস্তর চক্র দেখা গেল। এই স্থানেই পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয় ভদ্রলোক দ্বয়ের বিপদ ঘটে। এই স্থানে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মাঝি আমাদিগকে ধূমপান করিতে নিষেধ করিল। সতিশ ভায়া আরামে বসিয়া (Three castle) সিগারেটের ধূমাস্বাদ-সুখ অনুভব করিতেছিলেন এমন সময় 'সহসা বিজলি আসি খসিল সম্মুখে' যাইতে যাইতে হঠাৎ ধূমপান বন্দ! আশ্চর্য্যের কথা বৈকি! যখন মাঝির এবং গঙ্গাপ্রসাদের মুখে মধুমক্ষিকা-রাজ্যের আইন শুনিলেন তখন

ভায়া নিজে আইনজ্ঞ বলিয়াই বে-আইনি না করিয়া মধুমক্ষিকা-রাজ্যের law abiding subject হইয়া প্রিয় Three castle টিকে অগত্যা নর্ম্মদার বক্ষে ভাসাইয়া দিয়া ধূমপানে বিরত হইলেন।

কিয়দ্দূর যাইয়া আমাদের দক্ষিণে একটি গুহা দেখিলাম। সেটি মহর্ষি দাত্রেয়র আশ্রম ছিল। এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে হস্তী ও অশ্বের পদচিহ্ন অনুরূপ কতকগুলি দাগ দেখিতে পাইলাম। এ সম্বন্ধে যে গল্প শুনা গেল তাহা গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। কিছু পরে বামদিকে দেবাদিদেব গণেশের প্রতিমূর্ত্তি সহ একটি ছোট গুহা দেখিতে পাইলাম; ইহা গণেশ-গুহা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরিশেষে ধীরে ধীরে আমরা স্রোতের সম্মুখীন হইলাম। এইদিকে স্রোতের প্রতিকূলে আর অগ্রসর হওয়া অসুবিধা এবং দ্রষ্টব্য জিনিষও আর কিছুই নাই। মর্ম্মর পাহাড় এইখানেই শেষ হইয়াছে। এতক্ষণ নদীর মূর্ত্তি স্থির ছিল; এইবার অল্প অল্প স্রোত দেখা গেল। এই স্থান হইতে বরাবর স্রোতের বিপরীতে যাইলে নর্ম্মদার জলপ্রপাতে পৌছান যায়। এই জায়গার বামদিকে একটি ঘাট; এই ঘাটে একজন সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। আমরা এসময় সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলাম না। এই স্থানটির নাম স্বর্গদ্বার। এখান হইতে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

জলপ্রপাতের স্থান হইতে পঞ্চবটী ঘাট পর্য্যন্ত দেখিয়া মনে হয় যেন বেগবতী নর্ম্মদা মর্ম্মর-গিরিরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ তাহার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিয়া সদর্পে নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গিয়াছে;

এবং স্রোতস্বিনীর দুই কূলে গিরিরাজের দুই অর্দ্ধ অঙ্গ যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

নর্ম্মদার জল অতি স্বচ্ছ; টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী, পয়সা ইত্যাদি জলে ফেলিয়া দিলে ওখানকার লোকে ডুব দিয়া তৎক্ষণাৎ ধরিতে পারে; আমরা চক্ষাস দৃষ্টান্ত দেখিলাম। একাজ অনেকটা অভ্যাসগত হইতে পারে, কিন্তু এখানকার জলের স্বচ্ছ গুণ এ অভ্যাসকে বিশেষ সাহায্য করে একথা ঠিক। বেলা ১১টার সময় আমরা পঞ্চবটী ঘাটে ফিরিয়া আসিলাম। ঘাটে উঠিয়া নৌকার ভাড়া দিয়া মহর্ষি ভৃগু মুনির আশ্রম দেখিতে চলিলাম।

## মহর্ষি ভৃগু মুনির আশ্রম।

চৌষট্টি যোগিনীর পাহাড়ের পশ্চিম পথে নামিয়া যে রাজপথ দিয়া পঞ্চবটী ঘাটে আসিয়াছিলাম সেই পথে আমরাপুনরায় কিয়দ্দূর যাইয়া একটু দক্ষিণ দিকে নর্ম্মদার একবারে উপরে যে ঋষিশ্রেষ্ঠ জনার্দ্দন শ্রীহরির বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন সেই মহর্ষি ভৃগু মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পূরাণবর্ণিত আশ্রমের চিহ্ন এখন কিছুই নাই। চারিদিকে লোহার বেড়া দিয়া ঘেরা ১৫ বর্গ হাত আন্দাজ একটি বাঁধান চৌতারা মাত্র। চৌতারার মধ্যস্থলে একটু মৃত্তিকাময় স্থান, তাহার উপর একটি বেল ও তুলসী গাছ অতীত যুগের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান। সেই গাছের পার্শ্বে একটি লাল নিশান পোতা আছে; এবং চৌতারার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি গর্ত্ত কাটা আছে; তাহাতে বাৎসরিক একবার হোম হইয়া

থাকে। বেড়ার পশ্চিম পার্শ্বেই অতলস্পর্শ নর্ম্মদার গর্ভ, প্রায় ২০০ শত ফিট নিম্ন। দক্ষিণ দিকে একখানি খোলার ; সেখানে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া বাহিরে আসিলেন ; তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ পরিচয় করিয়া তৃপ্তিবোধ করিলাম। তাঁহার নিবাস নদিয়া জেলায়। চৌতারার পূর্ব্বদিকে একগজ ব্যবধান পরেই সরকারী ডাকবাঙ্গলো। উত্তর দিকে নর্ম্মদা বক্রগতিতে বহিয়া গিয়াছে।

মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম আমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। আশ্রম স্থানের নিজের যদিও আকর্ষণী শক্তি বিশেষ এখন কিছুই নাই, কিন্তু চারিদিকের দৃশ্য বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক ও নয়নরঞ্জক। এ দিকে কভু স্থির, কভু চঞ্চল নর্ম্মদার স্বচ্ছ-সলিল আশ্রমের পার্শ্ব দিয়া দর দর বহিয়া যাইতেছে ; ওদিকে সম্মুখেই গগন চুম্বি শুভ্রকান্তি মর্ম্মর শৈলশ্রেণী। পুণ্যাত্মার স্পর্শভূমি বলিয়াই হউক, অথবা মনোরম দৃশ্যাবলীর মাঝে বলিয়াই হউক, স্থানটিতে দাঁড়াইলে মনের প্রকৃতই ভাবান্তর উপস্থিত হয়। যে মহাত্মা এই স্থানে এক সময়ে ধ্যানস্তিমিত নয়নে একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার ধ্যানে জীবন উদ্যাপন করিয়াছিলেন, আজ সেই পবিত্র স্থানে আমাদের মত কত কলুষিত চরিত্র পদচারণা করিতেছে ! আজ সেই মহান ত্রৈবিশক্তি সম্পন্ন ঋষিবর কোথায় ! কখনও নাস্তিকতা, কখনও প্রগলভতা, কখনও ভগবানে যুগপৎ বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, কখনও সত্যাসত্য

নির্দ্ধারণে অক্ষম—এই স্থানে দাঁড়াইয়া এই অল্প সময় মধ্যে মনে এইরূপ কত তোলাপাড়া হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্রণাম করিয়া আশ্রম ত্যাগ করিলাম।

তখন বেলা ১টা বাজিয়াছে; ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণ অধীর। পঞ্চবটী ঘাটে আসিয়া স্নান করিয়া নারাণ বাবুর প্রদত্ত লুচি মোহনভোগ দ্বারা আমরা জঠরানল নির্ব্বান করিয়া, প্রাণভরিয়া নর্ম্মদার জল পান করিলাম। শরীরে যেন নূতন বল সঞ্চার হইল। তার পর ধীরপদবিক্ষেপে দুইজনে নানা বিষয় সমালোচনা ও তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে বানগঙ্গার তীরে আমাদের টাঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাপ্রসাদকে তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ ১৲ একটি টাকা দিয়া টাঙ্গায় আরোহণ করিলাম। সাধারণতঃ ।০ আনা হইতে ॥০ আনা একজন প্রদর্শকের পারিশ্রমিক। গঙ্গাপ্রসাদ আমাদের জন্য অত্যাধিক মেহনত করিয়াছিল, এমন কি আমাদের হ্যাণ্ডব্যাগটি নিজে বরাবর বহন করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে আমরা ১৲ টাকা দিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

আমরা টাঙ্গায় বসিলাম; এবার ঘরমুখো ঘোড়া। হু হু শব্দে টাঙ্গা ছুটিল। এখানহইতে এবার আমরা মদনমহল দেখিতে যাইতেছি।

## মদনমহল।

সহরের সংলগ্ন ইহা একটি পাহাড়ের উপরিস্থিত দুর্গ। গন্দজাতিদের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ। ইতিহাসে

এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। সম্রাট আকবরের প্রতিনিধি আসাফ খাঁ এক সময় এই প্রদেশ আক্রমণ করেন। গন্দবীর দলপতসার স্ত্রী রাণী দুর্গাবতী এই দুর্গে আশ্রয় লইয়া আসফ্ খাঁর সহিত যুদ্ধ করেন। রাণী দুর্গাবতীর পরাক্রম বড় কম ছিল না; তিনি বীর রমণীগণ মধ্যে পূজনীয়া ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে জব্বলপুর অঞ্চলে অনেক গল্প শুনা যায়। মদনমহল দুর্গের নির্ম্মাণ প্রণালী বড়ই অদ্ভুত রকমের; একখানি পাথরের মধ্যে প্রকাণ্ড দুর্গটি প্রস্তুত হইয়াছে। উপরে যাইবার ভাল পথ আছে। মদনমহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা বেলা ১॥ টার সময় নারাণ বাবুর বাসায় পৌঁছিলাম। নারাণ ভায়া এবং তাঁর দাদা তখন আহারাদি না করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমাদের জন্য তাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া সকলে একত্রে আহার করিতে বসিলাম। অধিক পরিশ্রমের পর এখন চর্ব্বচূষ্য লেহ্যপেয় ভোজন করিয়া দু'জনে আমরা ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলাম। সন্ধ্যা ৬টার সময় বোম্বে যাইবার ডাকগাড়ী জব্বলপুরে ছাড়ে। আমরা সেই গাড়ীতে আজ বোম্বে রওনা হইব, স্থির আছে। জব্বলপুরে বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিষ আর কিছু নাই; সবই একরকম দেখা হইল।

জব্বলপুর ৩টী ভিন্ন ভিন্ন রেলওয়ের জংসন ষ্টেশন; খুব বড় এবং জাঁকাল। একদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল লাইন

এখান হইতে এলাহাবাদ, গয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া কলিকাতাভিমুখে গিয়াছে, আর একদিকে গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনাস্থলা রেলওয়ে এখান হইতে ভারতের পশ্চিক দিকের শেষ সীমা সমুদ্র উপকুলস্থ বোম্বাই মহানগরীর ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ষ্টেশনে পৌছিয়াছে; এবং অন্যদিকে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ছোট লাইন (Narrow gauge) এখান হইতে পার্শ্ববর্ত্তী হাওবাগ হইয়া উহাদের নিজের বড় লাইনের (Broad gauge) গোন্দিয়া জংসনে মিলিয়াছে। বি, এন, রেলওয়ে এই গোন্দিয়া হইয়া নাগপুর দিয়া পশ্চিমে বোম্বাই, এবং পূর্ব্বদিকে খড়গপুর দিয়া কলিকাতা গিয়াছে। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে (Central Provinces) জব্বলপুর একটি প্রধান এবং বড় সহর। এখানে বিস্তর সাহেব-সুবা বাস করেন। চাকরি বাকরি ও ব্যবসা বানিজ্য উপলক্ষে বাঙ্গালীও অনেকগুলি আছেন। জল-বায়ু এখানকার বেশ স্বাস্থ্যকর। খাদ্য-দ্রব্য এক রকম সবই পাওয়া যায়। কলিকাতা বা বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বিশেষ কিছু সুলভ যে তা নয়। এখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব আজকাল প্রায় প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। জব্বলপুর কেন, সমগ্র মধ্যপ্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই প্লেগ আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এখানে কলকারখানা অনেকগুলি আছে। তন্মধ্যে বরণ কোম্পানীর এবং পারফেক্ট কোংর মাটীর বাসনের কারখানা (Potteryworks) উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ছোটখাট কারখানাও কয়েকটি আছে।

আমরা বিশ্রামান্তে এক এক বাটী "চা" পান করিয়া বোম্বে যাত্রার সাজ-সজ্জা করিতে লাগিলাম। নারাণ বাবু ও তাঁহার দাদা সেই রাত্রিটী তাঁহাদের বাসায় অবস্থান করিবার জন্য আমাদিগকে অত্যন্ত জেদ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব হইতে তারযোগে বোম্বের বন্ধুকে আমাদের সেখানে পৌছিবার সময় এবং তাঁহাকে বোম্বে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতে জ্ঞাপন করা হইয়াছে কাজেই নারাণ বাবুর ও তাঁর দাদার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় দুঃখিত হইলাম।

ডাকগাড়ী ছাড়িবার আধঘণ্টা পূর্ব্বে একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া আমাদের জিনিষপত্র লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বোম্বের দুইখানি টিকিট খরিদ করিয়া জিনিষ-পত্র ঠিক করিয়া রাখিয়া ৫।৭ মিনিট প্লাটফরমে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ডাকগাড়ী আসিয়া হাজির হইল। ষ্টেশনে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। আরোহীগণের ঠেলাঠেলী হুড়াহুড়ি, পানওয়ালা ও চুরুটওয়ালার চিৎকার, কুলিদের ছুটাছুটি ইত্যাদিতে ষ্টেশনের চেহারা হঠাৎ বদ্‌লাইয়া গেল। আমরা ইত্যাবসরে গাড়ীতে উঠিয়া আমাদের বসিবার প্রকোষ্ঠ বাছিয়া লইয়া নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া পড়িলাম। এখানে ডাকগাড়ী ২০ মিনিট অপেক্ষা করে। দেখিতে দেখিতে ২০ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া গেল; ঘণ্টা পড়িল, গার্ড-সাহেবের সবুজ নিশান উড়িল; গাড়ী ছাড়িয়াদিল। কত মেম, কত সাহেব আত্মীয় বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া বিদায় সম্ভাষণ

সূচক রুমাল দোলাইতে লাগিলেন। অনেক বাবু গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া বন্ধুগণকে চিৎকার করিয়া কত কি বলিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ষ্টেশনের সীমা অতিক্রম করিয়া নিমেষ মধ্যে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আসিয়া পড়িল। দুই দিকে প্রান্তরের পর প্রান্তর, জঙ্গলের পর জঙ্গল, গ্রামের পর গ্রাম, পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া দুর্দ্দমনীয় তেজে ডাকগাড়ী বসুন্ধরার বক্ষ দলন করিয়া দৌড়াইতে লাগিল।

জব্বলপুর ষ্টেশন হইতে ভেড়াঘাট যাইতে একখানি টাঙ্গার ভাড়া সাধারণতঃ ৩॥০ টাকা হইতে ৪৲ টাকা। যথাস্থানে এ কথা উল্লেখ করিতে ভুল হইয়াছে। পাঠক! সেজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।
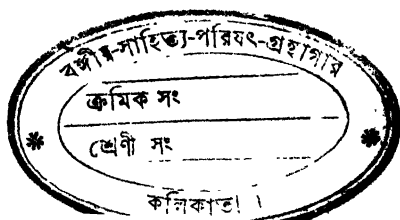
# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

## বোম্বাই।

রাত্রি ৮ টা ৭ মিনিটের সময় আমরা নরসিংগড়ে পৌছিলাম। যদিও সে সময় কেবল ষ্টেশনের আলোকে প্লাট ফরমের জনতা ব্যতীত অন্য কিছু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তখন জনতার দৃশ্যতেই অগত্যা নয়ন ও মনকে কতকটা তৃপ্তি করিতে লাগিলাম। দুইজনে বাক্যালাপে কতকক্ষণ অতিবাহিত করিবার পর রাত্রি ১০টার পর সোহাগপুরে আসিয়া পৌছিলাম। সোহাগপুরে গাড়ি প্রায় ১০ মিনিট কাল থাকে। এও খুব বড় ষ্টেশন। এখানে আরোহীগণের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত আছে। রাত্রির খাওয়াটা এইখানেই সকলকে সারিয়া লইতে হয়। আমরা নামিয়া ভোজন কার্য্য সমাধা করিয়া লইলাম। আহারান্তে গাড়ীতে উঠিয়া নিজ নিজ শয্যা বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। ক্ষণকাল নিশ্চিন্তভাবে ক্লান্তিহারিণী, জীবনে নবশক্তি-সঞ্চারিণী

নিদ্রাদেবীর শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনতিবিলম্বেই দেবী ধীরে ধীরে আমাদিগকে ক্রোড়ে লইলেন। সমস্ত দিন জব্বলপুরের নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, সমতল, উপত্যকা প্রভৃতি পরিভ্রমণের হাড়ভাঙ্গা মেহনতে শরীর আমাদের নিতান্ত অবসন্ন ছিল; কাজেই সে রাত্রির নিদ্রা যে কি রকম আরামদায়ক বোধ হইল তাহা বলিতে পারি না।

গর্ভধারিণী মাতার স্নেহের তুলনা নাই। তিনি পুত্রকে কোলে করিয়া যত্ন করেন, ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করেন। যদি কোন মতে পুত্রের নিদ্রা না আইসে তাহা হইলে তাঁহার সে যত্ন ব্যর্থ হয় এবং পুত্রও কিছুতেই আরাম পায় না। ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকে মা খাদ্য দিয়া সন্তোষ করিতে পারেন কিন্তু নিদ্রার্ত্ত পুত্রকে নিদ্রা ব্যতীত অন্য কি দিয়া সন্তোষ করিবেন! নিদ্রা আনিয়া দেওয়া ত তাঁর আয়ত্তাধীন নয়। হে সুখময়ী নিদ্রে! মা, তুমি গর্ভধারিণী মাতার অধিক শান্তিদায়িনী। মা! তোমার শক্তিতে জীবে নব জীবন প্রাপ্ত হয়। তুমি মা! বিমুখ হইলে জীবের বাঁচিবার উপায় নাই।

একটানা নিদ্রার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া আরামে সমস্ত রাত্রিটি আমাদের অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রাতে ৪॥ ঘটীকার সময় হটাৎ লোকের কোলাহলে আমাদের নিদ্রা ভাঙ্গিল। গাত্রোত্থান করিয়া দেখি, গাড়ি ভোসোয়াল জংসন ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিয়াছে। ভোসোয়াল একটি খুব বড় জংসন ষ্টেশন। এখান হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল নাগপুর এই উভয় রেলের

বোম্বে ডাকগাড়ী একই পথ দিয়া বোম্বে যাতায়াত করে। ই, আই, রেলের গাড়ী কলিকাতা হইতে আসানসোল, গয়া, মোগল-সরাই এবং জব্বলপুর হইয়া এবং ওদিকে বি, এন, রেলের গাড়ী কলিকাতা হইতে খড়্গপুর, চক্রধরপুর, বিলাসপুর এবং নাগপুর হইয়া ভোসোয়ালে আসিয়াছে। ভোসোয়াল হইতে এই একমাত্র পথ বোম্বে পর্য্যন্ত; আর পৃথক পথ নাই। বোম্বে হইতে এই একমাত্র পথ ভোসোয়াল হইয়া এদিকে জব্বলপুর পর্য্যন্ত এবং ওদিকে নাগপুর পর্য্যন্ত গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলা রেল কোম্পানির নিজের রাস্তা; এবং জব্বলপুর ও নাগপুব হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত এ দুটি পগ যথাক্রমে ই, আই, এবং বি, এন, রেল কোম্পানি দ্বয়ের। কলিকাতা হইতে একখানি বি, এন রেলের ও আর একখানি ই, আই, রেলেব ডাক গাড়ী প্রত্যহ বোম্বে যাতায়াত করে। নাগপুর ও জব্বলপুর পর্য্যন্ত যথাক্রমে উহাদের নিজের পথ দিয়া যাইয়া তারপর জি, আই, পি, রেলের পথ দিয়া বোম্বে যাইতে হয়। এই দুইটি ডাকগাড়ীর সহিত জি, আই, পি, রেলের অংশ আছে।

ভোসোয়ালেও গাড়ী প্রায় দশ মিনিট কাল থাকে। গাড়ী হইতে আমরা অবতরণ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া এক এক বাটী গরম "চা" পান করিলাম। ভোসোয়াল খাঁটি মারাহাট্টা অঞ্চল। এখানকার "চা" বিক্রয়ের প্রথা দেখিয়া বড় শ্রদ্ধা হইল। জলপূর্ণ একটি টবে কতগুলি 'চা'র খালি বাটী ডুবান আছে; উচ্ছিষ্ট "চা'র বাটীকে জলপূর্ণ টবের মধ্যস্থিত একটা বাটী করিয়া

জল তুলিয়া সতন্ত্রভাবে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইতেছে। কলিকাতার অনেক স্থানে দেখা যায় একটী জলপূর্ণ টবে সমস্ত উচ্ছিষ্ট বাটীগুলি ক্রমান্বয়ে ডুবাইয়া ধুইয়া থাকে। এটি অতি কদর্য্য প্রথা। একটী উচ্ছিষ্ট বাটী ডুবাইলে টবের সমস্ত জল উচ্ছিষ্ট হইল, তাছাড়া যাঁহারা সেই বাটীতে 'চা' পান করিয়াছেন তাঁহাদের পূর্ব্বে কাহারও যদি কোনও সংক্রামক ব্যাধি থাকে তাহা হইলে টবের সমস্ত জল দূষিত হইয়া গেল। সেই জলে অন্য বাটী ধুইয়া তাহাতে 'চা' পান করিতে দেওয়া কত দোষের তা বলা যায় না। এই রকমে আজ কাল আমাদের বাঙ্গালা অঞ্চলে যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, গর্ম্মি প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি সমূহের প্রাদুর্ভাব ক্রমেই বাড়িতেছে। ইহা ব্যারামের একমাত্র কারণ না হইলেও কারণাবলীর মধ্যে অন্যতম বটে।

যথা সময়ে গাড়ী ভোসোয়াল ছাড়িয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। এইবার রাত্রি প্রভাত হইয়াছে; দিঙ্মণ্ডল সূর্য্যালোকে আলোকিত হইল। এখন আমরা বোম্বাই প্রদেশের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বাঙ্গালা দেশের মত এখানে রেল পথের দুই পার্শ্বে সমতল ধান্যক্ষেত্র অতি বিরল। প্রায়ই সর্ব্বত্র উচ্চনিচ প্রস্তরময় জমি; তাহাতে গম, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষ হইয়া থাকে। ধানের চাষ খুব কম দেখিলাম। মাঝে মাঝে পাহাড় এবং গভীর জঙ্গল। বেলা ৭॥ টার পর মনমাদ জংসন পার হইলাম। মনমাদ হইতে "গোদাবরী ভ্যালি রেলওয়ে" (Godavary valley Ry.) নামে একটি ৩ ফিট ৬ইঃ চওড়া Metre Gauge রেললাইন হায়দারাবাদের নিজাম বাহাদুরের রাজধানী সেকন্দরাবাদ হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইহা নিজাম বাহাদুরের ষ্টেট রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত লাইন। ইলোরা গহ্বরে যাইবার সময় এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিব। বেলা ৭ টার সময় নাসিকে আসিয়া পৌঁছিলাম।

নাসিক ছাড়িয়া কিছুদূর যাইবার পর ক্রমশঃ শ্রেণীবদ্ধ পাহাড় ও জঙ্গল দেখিতে দেখিতে চলিলাম। লাহাভিট ষ্টেশন পার হইয়া এক বহুদূর ব্যাপি আকাশ ভেদী জঙ্গল দেখা গেল। জঙ্গলটী রেল পথ হইতে অনুমান ১০।১২ মাইল দূর হইবে। তারপর আসাভালি ষ্টেশন পার হইয়া দক্ষিণ দিকে এক সুদৃশ্য পর্ব্বত শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া গাড়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া মন্থর গমনে চলিতে লাগিল; যেন পাহাড়ের তালে তাল মিলাইয়া চলিতেছে। এখানে গাড়ীর গতি যেন কিছু হ্রাস বোধ হইতে লাগিল। গাড়ী যখন চড়াইয়ে উঠে তখন সমতল পথের ন্যায় সমান তেজে দৌড়াইতে পারে না। এই পর্ব্বতের অনেকগুলি শৃঙ্গ; তন্মধ্যে থালসিভাই দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমুদ্র তল হইতে ৫,৪২৭ ফিট উচ্চ। বেলা ২ টার সময় ইগাতপুরি ষ্টেশনে পৌঁছিলাম।

ইগাতপুরি ষ্টেশন সমুদ্র তল হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ থলঘাট পর্ব্বতের উপর স্থাপিত। ইগাতপুরি বোম্বাই প্রদেশের একটি স্বাস্থ্যনিবাস এবং অনেক সাহেব ও বড়লোকের গ্রীষ্মাবাস। এখানকার জল বায়ু নাতিশিতোষ্ণ। ষ্টেশন হইতে আধমাইল দূরে একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদের জল সহরের সর্ব্বত্র পানীয়রূপে সরবরাহ হইয়া থাকে।

ইগাতপুরির পর রিভার্সিং ষ্টেশন (Reversing)। রিভার্সিং

ইংরাজী কথা, মানে উল্টা। ইগাতপুরি পর্য্যন্ত গাড়ী বরাবর পশ্চিম মুখে আসিয়া রিভার্সিং ষ্টেশনে ইঞ্জিন সম্মুখ হইতে খুলিয়া গাড়ীর পশ্চাৎদিকে ব্রেকভ্যানের পর পূর্ব্বমুখ করিয়া লাগান হইল। এখান হইতে এবার গাড়ী পূর্ব্বমুখে বিপরীতদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর যাইয়া বক্রভাবে আসিয়া পুনরায় পশ্চিম মুখ করিল। প্রথমে সোজা যে ভাবে আসিতেছিল ঐরূপ যাইলে রাস্তার মাঝে মাঝে অনেকগুলি বেড় পড়ে; সেই বেড়গুলি কাটাইয়া অপেক্ষাকৃত সোজা পথে যাইবার জন্য পথটি এরূপে ঘুরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

এই স্থানে পর্ব্বতের অভ্যন্তর ঘরের থিলানের সাদৃশ্যে রেলগাড়ী যাতায়াতের উপযোগী প্রশস্ত করিয়া কাটিয়া পথ প্রস্তুত হইয়াছে। এরকম পথকে টনেল ( Tunnel ) বলে। থলঘাট পাহাড়ে পৌছিতে এরকম ১২টি টনেল পার হইতে হয়। টনেলগুলি লম্বা ২৬৫২ গজ। এখান হইতে কাসরা ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথ বরাবর ঢালুভাবে নামিয়া চলিয়া গিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে এই জায়গায় ৫৬ফুট লম্বা রাস্তায় ১ফুট ঢালু, এবং দুই এক স্থানে ৩৭ ফুটে ১ ফুট ঢালু আছে। এত বেশী চড়াই পথ রেল লাইনে খুব কম দেখা যায়। এই রকম চড়াই রাস্তায় গাড়ী নামা উঠা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

এই পার্ব্বত্য রেলপথের সৌন্দর্য্য বড় মনোহর। পাহাড়ের উপর ষ্টেশন; পাহাড়ের উপরে এবং উপত্যকায় অনেক ভদ্র

লোকের এবং রেল কর্ম্মচারীগণের আবাসস্থান। এরূপ স্তবকে স্তবকে নানা ছাঁদের ঘর ও তাহার আশে পাশে কোথাও নানারকমের গাছপালা এবং কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এলোমেলো ভাবে পড়িয়া আছে। পাহাড়ের উপরে, ধারে এবং উপত্যকায় কত সাহেব, মেম, ও বাবু ছড়িহাতে বেড়াইতেছেন। দৃশ্যটি ঠিক যেন ছবি। এ দৃশ্য নয়নে ও মনে যে কি রকম লাগিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। নামিয়া আমাদেরও ঐরূপ বেড়াইতে সাধ হইতে লাগিল। এমন সুন্দর স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে কি কাহারও ইচ্ছা হয়?

গাড়ী নিজ গতিতে চলিতেছে। ক্রমশঃ এ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। দেখিতে দেখিতে কাসারা ষ্টেশন পার হইলাম। বেলা ১০টা ১৬ মিনিটের সময় কল্যাণ জংসনে পৌঁছিলাম। কল্যাণও ছোট ষ্টেশন নয়, প্রকাণ্ড। এখান হইতে একটি শাখা রেলপথ পুনা হইয়া মান্দ্রাজ গিয়াছে। এখান হইতে বোম্বে ৩৪ মাইল পথ মাত্র। অনেক ডেলি প্যাসেঞ্জার (Daily passenger) কল্যণ হইতে বোম্বে যাতায়াত করেন। কল্যাণ যেন আমাদের বাঙ্গালার রাণাঘাট, ব্যাণ্ডেল বা শ্রীরামপুর। কল্যাণ ছাড়িয়া অধিকতর তৃপ্তিকর বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

এবার ক্রমশঃ বেলা যত অধিক হইতেছে গাড়ীতে থাকিতে ততই কষ্ট হইতে লাগিল। এখন কতক্ষণে বোম্বে পৌঁছাই এই ভাবিতেছি। বেলা ১২টা ৫ মিনিটের সময় ডাকগাড়ী বোম্বাই

ভিক্টোরিয়া-টারমিনাস ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। পৌছিয়া যেন বহুদূর পর্য্যটনকারী পরিশ্রান্ত পথিকের ন্যায় একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়িল।

এখন আমরা খাস বোম্বাই সহরে পৌছিয়াছি। ভিক্টোরিয়া-টারমিনাস প্রকাণ্ড ষ্টেশন। লোকে লোকারণ্য, চারিদিকে গোলমাল। গাড়ী হইতে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের বন্ধু প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়াছি। মনে করিয়া আসিতেছিলাম, হয়ত ষ্টেশনের জনতার মধ্যে আমরা পরস্পরকে খুঁজিয়া লইতে কষ্ট পাইব। কিন্তু কর্য্যতঃ কাহারও কোনও অসুবিধা হইল না। দেখিলাম প্লাটফরমে ওরকম বিশাল জনতার মধ্যে তিনিই একজন মাত্র নগ্নমস্তক বাঙ্গালী; সুতরাং বিনা আয়াসেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ; বোম্বে জর্নাডিকনসন্ কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী। গাড়ী হইতে প্লাটফরমে অবতরণ করিয়া ভুবন বাবুর সহিত সাদর সম্ভাষণ হইল। সে সময় তাঁহাকে আফিস যাইতে হইবে। কাজেই তিনি তাঁহার ভৃত্যের সমভিব্যহারে একখানি গাড়ী করিয়া আমাদিগকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিয়া তিনি বরাবর আফিস চলিয়া গেলেন।

আমরা যে গাড়ীতে উঠিলাম সেখানি কলিকাতা অঞ্চলের ফিটন গাড়ীর মত অনেকটা। ইহাকে ভিক্টোরিয়া গাড়ী বলে। এখানে এ রকম গাড়ীরই চলন সমধিক। ষ্টেশনে ঐ রকম গাড়ী

অসংখ্য দাঁড়াইয়া আছে। এখানে পাল্কি গাড়ীর চলন আদৌ নাই। স্ত্রী, পুরুষ সকলেই সমভাবে ঐ রকম গাড়ীতে সচ্ছন্দে চড়িতেছে।

আমরা ভুবন বাবুর বাসায় যাইয়া পৌছিলাম। ভুবন বাবুর বাসা বোম্বের গ্রাণ্ট রোডের উপরিস্থিত একটি ত্রিতল অট্টালিকায়। বাড়িটীর নাম "টুপিওয়ালা চল্।" বোম্বেতে বাড়ীকে "চল্" বলে। এখানে বাড়ীতে নম্বর থাকিলেও চিঠি পত্র ইত্যাদি নম্বর অপেক্ষা বাড়ীর নাম বলিয়া দিলে সহজেই পৌঁছায়। এইরূপ প্রায় এ সহরে সব বাড়ীরই এক একটি নাম আছে। আমরা ঐ টুপিওয়ালা চলের ত্রিতলে বন্ধুবর ভুবন বাবুর বাসায় যাইয়া উঠিলাম।

শরীর এখন ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অধীর। আহারের জন্য না হউক, অন্ততঃ স্নানের জন্য প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে। বাঙ্গালীর অভ্যাসগত আপাদ মস্তক তৈলমর্দ্দন করিয়া স্নান, একদিন বন্দ গেলে যেন কত অসুস্থতা বোধ হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে দু'জনে তৃপ্তির সহিত কলের মুখে বসিয়া পুরামাত্রায় স্নান করা গেল। শরীর স্নিগ্ধ হইল। স্নানান্তে ভোজন এবং ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম হইল। এ রকম বিশ্রামটা সতিশ ভায়ারই একচেটে; আমার কচিৎ কখনও ঘটিয়া থাকে।

সায়াহ্নের কিছু পূর্ব্বে আমরা একখানি গাড়ী করিয়া সহর পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। প্রথমতঃ সমুদ্রতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখি নাই। কাজেই সহসা জলধির আদি অন্ত বিহীন ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিশাল

কলেবর দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। স্নিগ্ধ সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে সমুদ্র-নীরের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে এবং মাঝে মাঝে বারিধির সহিত একটুক আধটুক্ সংঘর্ষ হওয়ায় আপনার দেহ আলোড়ন করিয়া জলধি মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদে আত্ম বলের পরিচয় দিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া তটে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। সেই মৃদু-মধুর কল্লোল কর্ণে যেন এখনও লাগিয়া আছে।

সমুদ্রের সহিত সমান্তরাল ভাবে প্রশস্ত রাজপথ সমুদ্র-তীরে বরাবর চলিয়া গিয়াছে। রাজপথের এক পার্শ্বে বিচিত্র বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন আকারের অসংখ্য সৌধশ্রেণী দণ্ডায়মান। অপর পার্শ্বে সমুদ্র অভিমুখে সারি সারি অসংখ্য বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে; এবং বেঞ্চের অব্যবহিত পরই সমুদ্রের প্রস্তরময় ঢালু তট। কত ভদ্রলোক ও মহিলা এই সময় এখানে বসিয়া সান্ধ্য-সমীরণ উপভোগ করিতেছেন। আমরাও একখানি বেঞ্চে উপবেশন করিলাম। বসিয়া অনন্যমনে লীলাময়ের সুবিস্তীর্ণ নীল লবনাম্বুর কল্লোল দেখিতে লাগিলাম।

আমরা অনেকক্ষণ ধরিয়া জলধির ও সমীরণের সন্ধ্যাকালীন ক্রীড়া অবলোকন করিয়া এখান হইতে এপলোবন্দর দেখিতে চলিলাম। তখন সন্ধ্যা সমাগত এবং সহর আলোক সাজে সুসজ্জিত হইয়াছে। এপলোবন্দর হইতে দূরবর্ত্তী সমুদ্র মধ্যস্থ বাতি ঘরের (light house) তীব্র আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলাম। বাতি ঘর সমুদ্র মধ্যস্থ অত্যুচ্চ মঞ্চের আকারের একটি ঘর।

বন্দরাভিমুখীন জাহাজাদিকে জলমগ্ন শৈল বা অন্য কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকিলে সঙ্কেতে ঐ বাতিঘর হইতে জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিয়া দেয়। এপলো বন্দরের সম্মুখেই 'তাজমহল' হোটেল। এটি ইংরাজী কেতার হোটেল। কলিকাতায় গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল যেমন, এখানে তাজমহল হোটেল সেই রকম। বাড়ীটি ত্রিতল, দেখিতে যেমন সুন্দর, সেই রকম সুন্দরভাবে সজ্জিত। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া যেন ইন্দ্রপুরী তুল্য বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, এবং শরীরও আমাদের অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় আর বেশীক্ষণ না ঘুরিয়া এখান হইতেই বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করা গেল।

ভুবন বাবু যে বাসায় থাকেন ঐ বাসায় বাবু বরেন্দ্রকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র সন্তান অবস্থান করেন। উঁহারা সকলেই জনডিকনসন্ কোম্পানির আফিসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারি; বড় অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক। আমরা তাঁহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। ভুবন বাবু আমাদের কেবল আলাপি বন্ধু তা নয়, সতিশ ভায়ার সহিত সম্বন্ধও আছে। ভুবন বাবু কেন, তাঁহাদের বাসাস্থ সকলেই আমরা যে কয়েক দিন বোম্বেতে ছিলাম, আমাদের সচ্ছন্দতার জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিতেন, তাহাতে আমরা লজ্জিত হইতাম।

পর দিন হইতে শরৎ বাবুর অনুগ্রহে আমরা ক্রমান্বয়ে বোম্বের

ভিক্‌টোরিয়া উদ্যান, এল্‌ফিনষ্টোন কলেজ, গ্রাণ্ট মেডিক্যেল কলেজ, মম্বাদেবীর মন্দির, মালাবার পাহাড়, বালুকেশ্বর, প্রিন্‌সেস্‌ ডক্‌, এলিফাণ্টাগুহা প্রভৃতি দেখিয়া শেষ করিলাম।

## ভিক্টোরিয়া উদ্যান।

এই উদ্যান দুই ভাগে বিভক্ত। এক অংশে মৃত জন্তু ও শিল্প জিনিষপত্র এবং অন্য অংশে জীবন্ত জন্তু আছে। আমরা প্রথমে মৃত জন্তুর ঘরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিতে পয়সাকড়ি কিছুই লাগিল না। ঘরটি দ্বিতল; খুব বড় নয়। কলিকাতার যাদুঘর (Asiatic meusium) অপেক্ষা অনেক ছোট। একঘণ্টার মধ্যে সমস্ত দেখা শেষ হইয়া গেল। কলিকাতার যাদুঘর যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা এখানে দেখিয়া কিছুই তৃপ্তি পাইবেন না। কলিকাতা যাদুঘরে যে সকল জন্তু জানোয়ার এবং শিল্প ঘরে (Art Gallery) যে সকল কারুকার্য্য আছে এখানে তাহার চতুর্থ ভাগের এক ভাগও নাই। কেবল নূতন জিনিষের মধ্যে এখানে "পার্সি টাওয়ার অফ্‌ সাইলেন্স"এর কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি আদর্শ দেখিলাম। "পার্সি টাওয়ার অব সাইলেন্স" পার্সিদের গোরস্থান, বোম্বে মালাবার পাহাড়ের সংলগ্ন।

বৃহৎ একখণ্ড জমি একটি বৃত্তাকার খুব উচ্চ প্রাচীরের দ্বারায় অবরুদ্ধ। এই প্রাচীরের অভ্যন্তর গাত্রেসংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ, শব রাখিবার উপযোগী বহু সংখ্যক বাঁধান স্থান আছে। পার্সি সম্প্রদায়ের নিযুক্ত একদল লোক তথায় সর্ব্বদা অবস্থান করে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ মৃতদেহ লইয়া প্রাচীরের বাহিরে

যাইয়া উপস্থিত হইলে ভিতরের ঐ নিয়োজিত ব্যক্তিরা প্রাচীরের উপর হইতে বাহিরের শব তুলিয়া ভিতরে আনে, এবং যথারীতি উল্লিখিত একটি বাঁধান স্থানে স্থাপন করে। প্রাচীরের তলদেশে চারিদিকে চারিটি জল নির্গমনের পথ আছে। মৃতদেহ ঐ স্থানে থাকিয়া ক্রমে যখন ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তখন ঐরূপ একটি পথ দিয়া ধুইয়া বাহির করিয়া দেয়।

প্রিন্‌সেস্ ডক ও এলফিনষ্টোন কলেজে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই; প্রায় সবই কলিকাতার ন্যায়।

## মালাবার পাহাড়।

অপরাহ্নে শরৎ বাবুর সহিত আমরা মালাবার পাহাড় দেখিতে চলিলাম। সমতল হইতে পাহাড় ১৫০ ফিট উচ্চ। উপরে উঠিবার উত্তম পথ আছে। আমরা সহরের দিকস্থ পথ দিয়া উঠিতে লাগিলাম। কতকদূর উঠিয়াই আবার সেই জব্বলপুরের মত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। দেখিলাম স্থানীয় ইতর ভদ্র কত লোক সমতল রাস্তায় চলিবাব মত সচ্ছন্দে দ্রুত উঠিয়া যাইতেছে। একটি ৩।৪ বৎসর বয়স্ক হিন্দুস্থানী শিশু তাহার মাতার সহিত গান করিতে করিতে ক্রীড়া ভূমিতে ছুটা-ছুটি করিবার ন্যায় অবহেলে উঠিয়া যাইতেছে। সে আমাদিগকে তাহার পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রে উঠিয়া চলিয়া গেল। তারপর আমরা আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপরে যাইয়া পৌছিলাম। সম্মুখে এক প্রশস্ত পরিষ্কার রাজপথ পাইলাম। সেই পথের দুই ধারে স্থানীয় ও বিদেশীয় অনেক ধনাঢ্য ভদ্র লোকের মনোরম

উদ্যান ও অট্টালিকা সকল পথের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। ঐ পথ ধরিয়া বামদিকে কিয়দ্দূর যাইয়া প্রথমে বোম্বের গভর্ণরের প্রাসাদ দেখিয়া বালুকেশ্বর দর্শন করিতে চলিলাম। বালুকেশ্বর দেবের মন্দির একবারে সমুদ্রকুলে মালাবার পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ইনি বহু পুরাকালের স্থাপিত শিবলিঙ্গ। কথিত আছে লঙ্কেশ্বর দশানন ইহাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। বালুকেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখেই একটি পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর চতুস্পার্শে রাস্তা এবং রাস্তার পর পাণ্ডাদিগের কলিকাতা বড় বাজারের মাড়োয়ারি মহল্লার ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্য দ্বিতল, ত্রিতল শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা। এস্থানে পবনদেবের প্রবেশাধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। গ্রীষ্মকালে এখানে নবাগত ব্যক্তির বাষ্পরোধ হইবার সম্ভাবনা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও এখানে সেইরূপ। এই অপরিষ্কার স্থানটি বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর অঙ্গে "ভানুমত্যাং তিলংযথা" বং। সব তীর্থক্ষেত্রেরই পাণ্ডা প্রভূদের একই কানুন দেখিতেছি।

এখান হইতে মালাবার পাহাড় রিজার্ভয়ার দেখিতে চলিলাম। এই রিজার্ভয়ার হইতে সমস্ত বোম্বাই সহরের পানীয় জল শোধিত হইয়া সরবরাহ হয়। রিজর্ভয়ারের সন্নিকটে পাহাড়ের উপর একটি মঞ্চ আছে। সেই মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আমরা বোম্বাই সহরের বহু দূরবর্ত্তী দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়া নয়নকে পরিতৃপ্ত করিলাম। কলিকাতায় গড়ের মাঠে অকটারলোনি মনুমেণ্টের উপর হইতে কলিকাতা সহরের দৃশ্য অপেক্ষা ইহা অধিকতর প্রীতি-

কর বোধ হইল। অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সৌধশোভিত সহর; চতুর্দ্দিকে অসীম অনন্ত নীল জলরাশি এবং তাহার উপর বিভিন্ন আকারের বিবিধ বর্ণের বিস্তর অর্ণবযান সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ভাসিতেছে। সহসা একখানি কল্পনা-প্রসূত আলেখ্য বলিয়া ভ্রম হয়। এখান হইতে প্রত্যাগমন করিলাম। একটি ভিন্ন পথ দিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করা গেল। তারপর ঐ বাসাস্থ একটী গুজরাতী বন্ধুর সহিত থিয়েটার দেখিতে চলিলাম। থিয়েটারটি গুজরাটী; বোম্বাইএ বাঙ্গলা থিয়েটার নাই। যথা সময়ে রঙ্গালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। আমরা গুজরাটী বন্ধুর সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিলাম। দেখিলাম কলিকাতার রঙ্গালয়ের সহিত ইহাদের সব বিষয়েই সামঞ্জস্য আছে। ঐক্যতান বাদ্য শেষ হইলে পর অভিনয় আরম্ভ হইল। অভিনেতা ও অভিনেতৃগণের নাচ গান, বক্তৃতা, হাবভাব ও বসন ভূষণের পারিপাট্য ইত্যাদিতে কিছুক্ষণ নয়নকে পরিতৃপ্ত করিলাম। যদিও আমাদের সঙ্গি গুজরাটী বন্ধুটি মাঝে মাঝে হিন্দি ও ইংরাজিতে তরজমা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন তথাপি আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে আমাদের ভাল লাগিল না। এক গর্ভাঙ্ক না শেষ হইতেই প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। দশ পনর মিনিট পরই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। প্রাতে এলিফান্টা গুহা দেখিতে যাইব স্থির করিয়া শয়ন করা গেল।

বোম্বাইএর সন্নিকটে চতুর্দ্দিকে এলিফাণ্টা, উরাও, বুচার প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ আছে। ট্রেণের মত সর্ব্বদা জাহাজ বোম্বাই হইতে এই সমস্ত দ্বীপে যাতায়াত করিতেছে। কাজেই এ সকল স্থানের অধিবাসীরা বোম্বাই নগরের সুখভোগ হইতে বঞ্চিত নয়। প্রত্যহ প্রাতে ৬ টার সময় বোম্বাই কার্ণাক বন্দর হইতে একখানি জাহাজ এলিফাণ্টা দ্বীপে যায় এবং সেখান হইতে বেলা ১২ টার সময় কার্ণাক বন্দরে ফিরিয়া আইসে। বোম্বাই হইতে এলিফাণ্টা ৬ মাইল পথ।

আমরা প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া শরৎ বাবুর সহিত একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া কার্ণাক বন্দরে যাইয়া পৌঁছিলাম। ৩ খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া জাহাজে উঠিলাম। জাহাজখানি বিশেষ বড় নয়; কলিকাতার পারঘাট ষ্টীমারের আকারের। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ছাড়িল। এ সময় বর্ষা ঋতু শেষ হইয়াছে। সমুদ্রের ভয়াবহ উত্তাল তরঙ্গমালা নাই। কিছু কিছু যাহা আছে তাহাই দেখিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। এরূপ ছোট ছোট সফেন তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া হেলিয়া ঢুলিয়া গজেন্দ্র গমনে জাহাজখানি এলিফাণ্টাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা জাহাজের উপর এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া চতুর্দ্দিকে সমুদ্রের শোভা দেখিতে লাগিলাম। যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি সেই দিকেই অসীম নীল জলরাশি। কূল কিনারা নাই। এবং উপরে অসীম অনন্ত নীল নভোমণ্ডল যেন মণ্ডলাকারে আসিয়া একবারে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

দেড় ঘণ্টা পর আমরা এলিফাণ্টা দ্বীপে পৌছিলাম। সেখানে ঘাটে জেটী নাই। নৌকা যোগে আমাদিগকে তীরে অবতরণ করিতে হইল।

জাহাজঘাট হইতে গুহা প্রায় দুই মাইল পথ। প্রায় সমস্ত দ্বীপটিই পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ। বোম্বাই হইতে নৌকাযোগে যাইলে একবারে গুহার সম্মুখস্থ ঘাটে উঠা যায়। জাহাজঘাট হইতে পাহাড়ের ধারে ধারে আঁকিয়া বাঁকিয়া একটী পরিষ্কার পথ গুহার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্বে এপথটি সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কার ছিল। ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ করোনেশান উপলক্ষে যখন ভারতে পদার্পণ করেন তখন তিনি এই গুহা দেখিতে যান। সেই সময় তাঁহার মটরগাড়ী যাইবার উপযোগী করিয়া এই পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা তিনজন ছাড়া আরও তিনজন বাঙ্গালী ও তিনজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আমাদের সহিত আজ এলিফাণ্টা যাত্রী আছেন। সকলে একত্রে হাস্য কৌতুক করিতে করিতে এই পথ ধরিয়া গুহাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা গুহার দ্বারদেশে যাইয়া পৌঁছিলাম। প্রথমে একটি সরকারি আফিস, এবং আফিসের সম্মুখে একখানি করগেটেড্ টিনের আটচালা। আটচালায় দর্শকগণের বিশ্রাম জন্য খানকয়েক বেঞ্চ পাতা আছে। আফিসে দুই জন জিয়োলজিকাল (Geological) বিভাগের ইউরোপীয় কর্ম্মচারি আছেন।

গুহায় প্রবেশের টিকিটের মূল্য।০ চারি আনা। ঐ আফিস হইতে আমরা এক একখানি টিকিট খরিদ করিলাম। গুহার

দ্বারদেশে একজন প্রহরী সর্ব্বদা হাজির আছে। তাহাকে টিকিট দেখাইয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

গুহা বলিলে সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ে খোদিত গর্ত্ত বলিয়া বুঝায়। আমাদেরও এই সকল গুহা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ধারণা ছিল। এখন এলিফাণ্টা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম এ কি রকম অদ্ভুত গুহা। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ সুদীর্ঘ ফটকের আকারে মসৃণভাবে কাটিয়া প্রবেশ পথ করিয়া অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পাহাড় কাটিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা গুহা বা বন্যজন্তুর আবাসের গর্ত্ত নয়; ইহা উচ্চশ্রেণীর মানবের বাসোপযোগী ঘর। কেবল ঘর বলিলেও ঠিক বলা হয় না। ইহা সুরম্য রাজপ্রাসাদ এবং সংযুক্ত দেবালয়। এরূপ গুহা ভারতবর্ষের বোম্বে প্রেসিডেন্সিতেই অধিক। প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ইহাদিগকে গুহা দেবালয় (Cave Temples) বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতে এরূপ যতগুলি গুহা দেবালয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে ইলোরা গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও অদ্ভূত, এবং পৃথিবীর যাবতীয় আশ্চর্য্যজনক পদার্থের অন্যতম। কথিত আছে এই সমস্ত গুহা দেবালয়গুলির খৃষ্ট ২৫০ পূর্ব্বাব্দে সৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং খৃষ্ট ৮০০ পরাব্দে শেষ হয়।

এলিফাণ্টা গুহার সম্মুখে সমুদ্রকুলে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড এক হস্তী মূর্ত্তি পূর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। তাহা হইতে পর্ত্তুগিজেরা ইহার এলিফাণ্টা গুহা নাম দিয়াছে। সমুদ্র হইতে ২৫০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতোপরি এই গুহা অবস্থিত। উত্তর দিকে পাশাপাশি দুইখানি

গাড়ী যাতায়াতের উপযোগী প্রশস্ত ফটক বা প্রবেশ দ্বার চারিটী ২০ ফুট উচ্চ থাম দ্বারা রক্ষিত। থামের উপরে গোলাকার খিলান এবং খিলানের উপর পাহাড় ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ভীষণ জঙ্গল। সমস্ত গুহাটি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। ফটক পার হইয়া আমরা প্রথমতঃ একটী দালান বা হলে উপস্থিত হইলাম। হলটি ১৩০ ফুট লম্বা ও প্রায় ৫০ ফুট প্রশস্ত। এবং উপরিভাগ বা ছাদ ৪২টি থাম দ্বারা সুরক্ষিত। তন্মধ্যে ২৬টি ১৯ ফুট, এবং ১৬টি ১৫ ফুট উচ্চ। থামগুলি স্থানান্তর হইতে আনিয়া যে এখানে বসান হইয়াছে তা নয়। ছাদ হইতে তলদেশে পর্য্যন্ত একখানি পাথর ভিতর হইতে কাটিয়া এক একটি থাম বাহির করিয়াছে। যেমন তেমন করিয়া যে কাটিয়া কোনও রকমে থামের আকারে খাড়া করিয়াছে তা নয়। প্রত্যেক থামটি এক মাপের, এমন কি আধ ইঞ্চ ছোট বড় কোনও অংশে নাই। প্রত্যেক থামটিতে নানা রকম খোদিত কারুকার্য্য আছে। হলের পশ্চাৎ দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন, দেওয়াল হইতে খোদিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ১৭ ফুট উচ্চ একত্রে মিলিত এক বিরাট ত্রিমূর্ত্তি। ত্রিমূর্ত্তির দুই পার্শ্বে দুই বিশাল বপু ১২ ফুট উচ্চ দ্বারপাল দণ্ডায়মান। এ মূর্ত্তিগুলিও পাহাড় হইতে কাটিয়া বাহির করা। হলের একটু দক্ষিণদিকে একটি মন্দির ; তাহার অভ্যন্তরের মাপ ১৯ বর্গহাত। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি বেদী এবং তাহার উপর শিবলিঙ্গ আছেন। এই মন্দিরটি ও লিঙ্গ উভয়ই আদত পাহাড় হইতে খোদাই করিয়া বাহির করা।

হলের দুই পার্শ্বে দুই প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পর দুইটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ। একটি প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে দুইটি সিংহমূর্ত্তি আছে; এ প্রকোষ্ঠ দুটিও ছোট নয়। আগাগোড়া সমস্ত গুহার দেওয়ালের সর্ব্বত্রই নানা প্রকার দেবদেবীর খোদিত মূর্ত্তি বর্ত্তমান। দক্ষিণদিকের প্রাঙ্গণের এক স্থানে একটি জলের উৎস আছে। জল অতি স্বচ্ছ। আমরা সেই জলে মুখ হাত ধুইয়া পান করিলাম। দক্ষিণদিকের প্রকোষ্ঠের পাশে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট ঘর দেখিলাম। সেটি ভাণ্ডারগৃহ বলিয়া অনুমান হইল।

সকলে আমরা তারপর বাহিরে আসিয়া টিনের আটচালায় বেঞ্চে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম ও গুহা সম্বন্ধে আমাদের অনেক আলোচনা হইতে চলিল। বর্ত্তমান যুগে স্থপতি বিদ্যা প্রভৃতি শিল্প বিজ্ঞান উন্নতির চরম সীমায় আসিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে সত্য। কিন্তু যাহারা অতীত যুগের এই সমস্ত শিল্প দেখিবেন তাঁহারা বিনা তর্কে ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিবেন, নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে যে কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য্য কঠিন পাথরের উপর সম্পন্ন করিয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে কূল কিনারা পাওয়া যায় না। এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করা মানব ক্ষমতার আয়ত্তাধীন বলিয়া মনে হয় না। স্থানীয় প্রদর্শকগণ বলিয়া থাকে পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই সকল গুহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। আবার কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধগণ দ্বারা নির্ম্মিত। একথাও যে ঠিক তাহারও কোনও প্রমাণ নাই।

আমরা কোনও স্থানে কোনও শিলালিপি দেখিতে পাইলাম না। ইহার মীমাংসা হওয়া কঠিন। পাঠক! ইলোরা গুহার বিবরণ যখন পাঠ করিবেন তখন বুঝিবেন এ রকম দুঃসাধ্য কার্য্য মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কতদূর সম্ভব।

বেলা ১১টা বাজিয়াছে। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়াছি। কিছু না হউক অন্ততঃ একবাটি 'চা' পাইলে কাতরতার লাঘব হয়, ভাবিতেছি। আমাদের কেহ কেহ আটচালার বেঞ্চের উপর গা ঢালিয়া সমুদ্র বায়ু সেবন করিতেছেন, কেহ বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বৃক্ষতলে শিলার উপর বসিয়া সমুদ্রের শোভা অবলোকন করিতেছেন, কেহ বা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। আমি ঐ সময় আফিসে যাইয়া সাহেব কর্ম্মচারিদ্বয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে গুহার খানকয়েক ফটোগ্রাফ খরিদ করিলাম। ছবিগুলি পোষ্টকার্ডের আকারের; প্রত্যেকের দাম /০ এক আনা করিয়া। সাহেব দুইজন বড় ভদ্র। উঁহাদের একজন পূর্ব্বে হাওড়া শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনএ (Botanical Garden) কাজ করিতেন। তিনি বাঙ্গালা দেশে অনেক দিন যাবৎ থাকায় তাঁহার বাঙ্গালীর উপর অত্যন্ত মায়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারিলে যারপর নাই সমাদর করিতে লাগিলেন। আমাকে "চা" পান ও ধুম পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ পর আমরা একত্রে দলবদ্ধ হইয়া জাহাজঘাট অভিমুখে রওনা হইলাম।

বেলা প্রায় ১২॥ টার সময় আমরা জাহাজঘাটে পৌছি-

লাম। তখন জাহাজ আসে নাই বা জাহাজের আগমনের কোনও চিহ্নও নাই। টিকিট ঘর হইতে টিকিট খরিদ করিয়া জাহাজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরই জাহাজের ধুঁয়া দেখা গেল এবং অনতিবিলম্বেই অর্ণবপোত সমুদ্রের নীল জলরাশি কাটিতে কাটিতে আসিয়া ঘাটে লাগিল।

আমরা নৌকাযোগে জাহাজে যাইয়া উঠিলাম। মৃদু মন্দ তরঙ্গ হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে জাহাজখানি আমাদিগকে বক্ষে করিয়া আনিয়া কার্ণাক বন্দরে নামাইয়া দিল। কার্ণাক বন্দর হইতে ট্রাম করিয়া আমরা বেলা ২॥ টার সময় বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। স্নান আহার সমাধা করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করা গেল।

বোম্বাই সহর দৈর্ঘ্যে আট মাইল হইবে। এই আট মাইলের মধ্যে ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ হইতে সায়ন্ পর্য্যন্ত দশটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এখানে ট্রামের মত রেলগাড়ি সর্ব্বদা গমনাগমন করিয়া থাকে। লোকে ট্রামের সুবিধা এখানে রেলেও ভোগ করিতে পায়।

বোম্বাই সহর কলিকাতা অপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দর। রাস্তাগুলি চওড়া ও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; একবারে আবর্জ্জনা শূন্য। তক্ তক্ করিতেছে। দুই পার্শ্বে ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল আট্টালিকা সকল। অত বড় সহর দুই এক স্থান ব্যতীত, কোনও পথে লোকজনের ভিড় বা ঠেলাঠেলি নাই, অথচ সহরের অধিবাসীর সংখ্যা খুব বেশী। স্বাধিনা পার্সি রমণীগণ দলে দলে হাত ধরাধরি করিয়া কেমন স্বাধীনভাবে নির্ভীক চিত্তে

রাজপথে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দরীদিগের অটুট অপ্সরা-বিনিন্দীত সৌন্দর্য্য-রাশি যেন সহরের সৌন্দর্য্য চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

খাদ্য দ্রব্যের দর প্রায় কলিকাতার সমতুল্য। বাঙ্গালা দেশের মত সব জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। সমুদ্রের মাছ যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়। বাড়ীর ভাড়া কলিকাতা অপেক্ষা অধিক। এক খানি ১৮ ফুট লম্বা ১৫ ফুট চওড়া ঘরের ভাড়া অন্যুন মাসিক ২০৲ টাকা। চাকরবাকর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সস্তা নয়।

বোম্বাই প্রকৃতপক্ষে মারহাট্টা দেশ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের অধিবাসী মারহাট্টা, গুজরাটী ও পার্সি বেশীর ভাগ। অন্যান্য জাতি উহাদের তুলনায় যৎসামান্য। বাঙ্গালী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ৭০ জনের অধিক হইবে না। এখানে পার্সিসম্প্রদায়েরই প্রাধান্য বেশী এবং ইহারাই এখানে প্রধান ব্যবসায়দার। বোম্বাই ভারতের অদ্বিতীয় বন্দর এবং সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে যে পরিমাণে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হয় ভারতের অন্য কোনও বন্দরে সেরকম হয় না।

বোম্বাইএ আমাদের দেখাশুনা সবই একরকম শেষ হইয়াছে। আজ ২৯শে অক্টোবর রাত্রিতে আমরা পুনা যাত্রা করিব স্থির আছে। বিশ্রামান্তে জিনিষপত্র গুছাইয়া ফেলিলাম। আহারাদি করিয়া রাত্রি সাড়েনয়টার সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া আমরা ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ ষ্টেশনে যাইয়া পৌছিলাম।

ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ ষ্টেশন ভারতবর্ষের সমস্ত ষ্টেশন অপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। হাওড়ার বর্ত্তমান নূতন ষ্টেশন প্রায় ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের অনুরূপ হইয়াছে। আমরা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া খবর লইয়া জানিলাম পুনার ট্রেণ ছাড়িবার কিছু বিলম্ব আছে। দুখানি টিকিট খরিদ করিয়া আমরা প্লাট ফরমে ইতঃস্তত বেড়াইতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে বৈদ্যুতিক আলোক মালায় শোভিত, সুন্দর ভাবে সাজান ষ্টেশনটি যেন ইন্দ্রের অমরা-বতী তুল্য বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে প্লাটফরমে পুনার গাড়ী আসিয়া লাগিল। আমরা আমাদের জিনিষপত্র সহ গাড়ীতে উঠিলাম। রাত্রি ১০টা ২৫ মিনিটের সময় গাড়ী ছাড়িল ক্রমে বোম্বাই সহরের সীমা ছাড়াইয়া সীমান্তরে পড়িলাম প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গাড়ী চলিল।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

## পুনা।

প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় পুনায় পৌঁছিলাম। পুনা ষ্টেশনের সন্নিকটে ২।৩ মিনিট পথ দূরে, "রাজমহল" হোটেল অবস্থিত। আমরা পূর্ব্ব হইতে এই হোটেলের খবর লইয়া রাখিয়াছিলাম। ষ্টেশন হইতে একবারে সোজাসুজি আমরা "রাজমহল" হোটেলে যাইয়া উঠিলাম। পৌঁছিয়া হোটেলের ম্যানেজারকে খবর দিলাম। ম্যানেজার একজন নব্যযুবক; বেশ অমায়িক লোক। তিনি আমাদের থাকিবার জন্য একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন। জিনিষপত্র সেখানে রাখিয়া প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া কিছু জলযোগ ও "চা" পানান্তে, এক খানি গাড়ী করিয়া সহর ভ্রমণে বাহির হইলাম। এখানেও বোম্বাইএর মত ভিক্টোরিয়া গাড়ীর চলনই সমধিক। প্রথমে আমরা পার্ব্বতী পাহাড় দেখিতে চলিলাম।

পার্ব্বতী পাহাড় ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল পথ

পাহাড়ের পাদদেশে গাড়ী রাখিয়া সেখানকার একজন প্রদর্শককে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

পার্ব্বতী পাহাড় সমতল হইতে দুইশত ফিট উচ্চ। উপর পর্য্যন্ত বরাবর প্রস্তরের বাঁধান প্রশস্ত সোপান আছে। এবং জায়গায় জায়গায় সোপানের পার্শ্বে একখানি করিয়া লৌহার বেঞ্চ পাতা আছে। দর্শকগণ পরিশ্রান্ত হইলে তথায় বিশ্রাম করিতে পারেন। উঠিতে উঠিতে বুঝিলাম, মাঝে একবার অন্ততঃ কিছুক্ষণ বিশ্রাম না লইয়া একবারে একটানে উপরে উঠা কষ্টকর। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এক স্থানে একটুকু বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিছু দূর উঠিলে পর, একজন ব্রাহ্মণ আমাদের পশ্চাতে আসিয়া জুটিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ে বুঝিলাম তিনি ঐ পার্ব্বতি পাহাড়ের একজন পূজারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার সহিত অনেক রকম গল্প করিতে করিতে আমরা উপরে উঠিতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা পাহাড়ের প্রথম স্তরে যাইয়া উপনীত হইলাম। এখান হইতে ব্রাহ্মণ আমাদিগকে প্রথমতঃ তৃতীয় বা শেষ স্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রবল পরাক্রান্ত মারহাট্টা রাজবংশ পেশোয়া দিগের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে তাঁহাদের অতীত বীরত্ব-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে।

মারহাট্টা গৌরব-রবি বলজি বিশ্বনাথ ভট্ট, পেশোয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁদের রাজত্ব আরম্ভ হয়। তিনি একজন কঙ্কণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজ-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পার-

দর্শিতা দেখিয়া শিবজির পৌত্র. রাজা সাহু (তৃতীয় শিবজী) তাঁহাকে পেশোয়া উপাধি প্রদান করেন। "পেশোয়া" শব্দের অর্থ, "যে ব্যক্তি রাজাকে কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিতে পারে"। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নানা ফারনবিশ্ নামক ইহাঁদের একজন পরাক্রমশালী নেতার মৃত্যু হওয়ায়, পেশোয়া বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় বাজীরাও হীনবল হইয়া পড়িলেন, এবং নানাদিক হইতে নিগ্রহ ভোগ করায়, পরিশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন।

পেশোয়ার প্রাসাদের সম্মুখে এক উচ্চ দেব মন্দির আছে। মন্দির দর্শন করিয়া এখান হইতে আমরা পর্ব্বতের দ্বিতীয় স্তরে নামিয়া, পার্ব্বতী-তনয় ষড়ানন কার্ত্তিকের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কার্ত্তিকের দুই হস্ত পরিমিত উচ্চ কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত উজ্জ্বল মূর্ত্তি, দর্শন করিয়া প্রাণ পুলকে পুরিয়া গেল।

তার পর এখান হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ের তৃতীয় স্তরে পার্ব্বতী দেবীব মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে জুতা ত্যাগ কবিয়া আমরা মন্দিরের দ্বারে যাইয়া প্রণাম করিলাম। পূজারী ব্রাহ্মণ আমাদিগকে হর পার্ব্বতীর যুগলমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। এ মূর্ত্তি দুটী আকারে ছোট; এক ফুটের অধিক উচ্চ নয়; কাঞ্চন নির্ম্মিত। গঠন অতি সুন্দর ও উজ্জ্বল। আরও কয়েক জন মারহাট্টা ভদ্রলোক ও মহিলা দর্শক এ সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন।

পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরের পার্শ্বে আর একটী ছোট মন্দির আছে। তাহার মধ্যে একটী অপরিষ্কার ভাবে খোদিত প্রস্তর

মূর্ত্তি রহিয়াছে। সেটীও পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া শুনিলাম। কথিত আছে, ইহাঁকে দ্বিতীয় পেশোয়া ঐ পাহাড়ের জঙ্গল মধ্যে, কোনও স্থানে অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পান। কিম্বদন্তি, দ্বিতীয় পেশোয়া দেবীর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, ও তথায় দেবীকে স্থাপন করেন; এবং সেই সময়ে এখানে তাঁহার প্রাসাদও নির্ম্মিত হয়। পার্ব্বতী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে, একটী দুই বর্গ হাত প্রশস্ত গহ্বর একখণ্ড কাষ্ঠ ফলক দ্বারা আবৃত রহিয়াছে দেখিলাম। সেটী একটী সুড়ঙ্গের দ্বার। উহার ভিতর দিয়া ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী আমেদনগরে চাঁদ বিবির মহল পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যাওয়া যাইত; এখন ঐ পথ বন্দ হইয়া গিয়াছে।

আলোকসামান্য রূপবতী চাঁদ বিবি দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ বীর রমণী। ইনি আমেদনগর-রাজ হোসেন নিজাম সাহার কন্যা। ইহাঁর রূপে মোহিত হইয়া বিজাপুররাজ আলি আদিল সাহ ইহাঁর পাণি গ্রহণ করেন। ইনি পতিভক্তির আদর্শনীয়া ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিক দিন ইহাঁর পতি সহবাস সুখ স্থায়ী হইতে পায় না। ১৫৮০খৃষ্টাব্দে ইহাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন। সুতরাং তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্বামীর ভ্রাতস্পুত্র নাবালক ইব্রাহিমকে বিজাপুরের সিংহাসনে বসাইলেন, এবং নিজে অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পর বিজাপুরে নানাপ্রকার অশান্তি ও গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইলে, চাঁদ বিবি বিরক্ত হইয়া বিজাপুর ত্যাগ

করিয়া পিতৃরাজ্য আমেদ নগরে চলিয়া গেলেন। এখানেও তিনি শান্তি পাইলেন না। এখানে ক্রমে চতুর্দ্দিকে গোলমাল ও অরাজক হইয়া পড়িল। আমেদ নগরের রাজা ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র বাহাদুরকে রাজা করিবার জন্য চাঁদ বিবি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে কতগুলি লোক চাঁদ বিবির বিপক্ষ হইয়া সম্রাট আকবরের পুত্র মুরাদের সাহায্য প্রার্থনা করিল। মুরাদ সসৈন্যে আমেদ নগর অবরোধ করিলেন। দুর্গের প্রধান প্রধান সেনাপতিরা ভয়ে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, বীর বালা চাঁদ বিবি স্বয়ং অসি হস্তে দুর্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোমলাঙ্গী রমণীর বীরত্ব দর্শনে তাঁহার সেনাপতিরা লজ্জিত হইয়া অবশেষে যুদ্ধে যোগ দিলেন। মোগল সৈন্য পরাস্ত হইল, এবং মুরাদ অসুবিধা দেখিয়া সন্ধি করিয়া আমেদ নগর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পর মোগল সৈন্য পুনরায় আমেদ নগর অবরোধ করিল। চাঁদ বিবিও পুনরায় রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মোগলবাহিনীর গতিরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু এবার আমেদ নগরের যোদ্ধারা সম্মুখ সমরে পরাঙ্মুখ হওয়ায়, চাঁদ বিবি অগত্যা সন্ধি করিয়া মান সম্ভ্রম বজায় রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষীয় হামিদ খাঁ প্রভৃতি সৈন্যগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, সমস্ত সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিল, এবং একদিন অতর্কিত ভাবে চাঁদ বিবির গৃহে প্রবেশ করিয়া বীর বালার প্রাণ বিনাশ করিল।

যে দিন চাঁদ বিবি আমেদ নগরে মৃণ্ময় স্তম্ভ স্থাপন করেন, সেই

দিন হইতে তাঁহার কীর্ত্তি ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতে থাকে। চাঁদ বিবির রূপে মুগ্ধ হইয়া মালিকাম্বর তাঁহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে, প্রস্তাব করিয়া দূত প্রেরণ করেন; তাহাতে চাঁদ বিবি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে চমকিত হইয়া উঠিতে হয়।

চাঁদ বিবি কখনও অলঙ্কার পরিতেন না। সাধারণ পরিচ্ছদ—শাড়ী ও কাঁচুলি পরিধান করিয়া তিনি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেন। সকল স্থানেই প্রায় তিনি একা বেড়াইতেন; সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বদা এক খানি তরবারি থাকিত। তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া, কেহ তাঁহার প্রতি কখনও আসক্তির ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইত না। ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি অবিবাহিতা ছিলেন।

পার্ব্বতী দেবীর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে পেশোয়ার মান মন্দিরের জীর্ণ কলেবর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এখনও লোকে তাহার উপর আরোহণ করিয়া থাকে। আমরাও উপরে উঠিলাম। উপর হইতে পুনা সহরের চতুর্দ্দিকস্থ বহু দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। এ মানমন্দিরের যে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হইল অল্পদিন মধ্যে ইহার অস্তিত্ব লোপ হইবে।

আমরা মানমন্দির হইতে অবতরণ করিয়া, পথে মিলিত ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিয়া পাহাড় ত্যাগ করিলাম। এখান হইতে আমরা বন্দ্ বাগান (Bund

Garden) দেখিতে চলিলাম। পুনার বন্দ্ গার্ডেনে দেখিবার মত জিনিষ বিশেষ কিছুই পাইলাম না। বাগানের মধ্যে ক্ষণকাল ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া. এখান হইতে পুনা রেশমের কারখানা (Silk factory) দেখিতে চলিলাম। পৌছিয়া কারখানার ফটকের বাহিরে গাড়ী রাখিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা ১১টা বাজিয়াছে। কারখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতির জন্য প্রথমে আফিসে যাইতে হইল। সে সময় আফিসে একজন মাত্র পদস্থ প্রৌঢ় মারহাট্টা কর্ম্মচারি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনিবা মাত্র একজন ভৃত্যকে প্রদর্শকরূপে আমাদের সঙ্গে দিলেন। আমরা তাহার সাহায্যে এক এক করিয়া কারখানার সমস্ত পর্য্যাবেক্ষণ করিলাম।

প্রথমতঃ একটী ঘরে গুটী হইতে রেশম প্রস্তুত হইতেছে, ও আর এক স্থানে ঐ রেশম হইতে কলে সুতা প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। অন্য এক ঘরে বহু সংখ্যক কলের তাঁত বসান আছে। সুতা বাণ্ডিল হইয়া এই ঘরে আসিয়া, এখানে ঐ সমস্ত তাঁতে বিবিধ বর্ণের ও বিবিধ ধরণের শাড়ী প্রভৃতি বোনা হইতেছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের স্ত্রীলোকেরা বোম্বাই শাড়ী নামে যে রেশমের শাড়ী পরিধান করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই পুনার রেশমের কারখানায় প্রস্তুত। তারপর অন্য এক ঘরে ঐ সমস্ত কাপড় যাইয়া ভাঁজ হইয়া গাঁইট বাঁধা হইতেছে।

রেশমের কারখানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সুতার কারখানা

দেখিলাম। এখানেও ঐ রকমে কার্পাস হইতে সুতা এবং সুতা হইতে কাপড় প্রস্তুত হইয়া গাঁইট বাঁধা হইতেছে। দুইটী কারখানা সমস্ত দেখা শেষ হইলে, কেরানী বাবুর সহিত বিদায় সম্ভাষণ করিয়া গাড়িতে উঠিলাম। বেলা দেড়টার সময় বাসায় ফিরিলাম। আহারের পর যথারীতি ক্ষণকাল বিশ্রাম উপভোগ করা গেল। সতিশ ভায়ার কেবল বিশ্রাম নয়—সুনিদ্রা সেই সঙ্গে।

ফার্গুসান কলেজ ও তন্নিকটস্থ পাণ্ডব গুহাও পুণার মধ্যে দেখিবার জিনিষ। ফার্গুসাল কলেজে বিশেষত্ব কিছুই নাই। এবং পাণ্ডব গুহা বোম্বের এলিফান্টা গুহার অনুরূপ।

আজ আমাদিগকে এখান হইতে নাসিক যাইতে হইবে স্থির আছে; কাজেই বৈকালে ৩টা ১৫মিনিটের গাড়িতে কল্যাণ রওনা হইলাম। সন্ধ্যা ৬ টা ১৮ মিনিটের সময় কল্যাণ জংসন ষ্টেশনে পৌছিলাম। কল্যাণ হইতে রাত্রি ৯ টা ৪৩ মিনিটের সময় নাসিক যাইবার গাড়ি ছাড়ে। আহারাদি শেষ করিয়া, গাড়ির প্রতীক্ষায় এই নাতিদীর্ঘ সময়টুকু ষ্টেসন প্লাট-ফরমে একবার বসিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, অস্থিরতার সহিত কাটাইতে হইল। যথা সময়ে গাড়ি আসিয়া পৌছিলে আমরা যাইয়া গাড়িতে বসিলাম। এবার কল্যাণ হইতে আমরা যতই পূর্ব্বাভিমুখে আসিতেছি, শীতের আভাষ ততই বেশ স্পষ্ট বুঝিতেছি। ক্রমে কম্বল বাহির করিয়া গায়ে ঢাকা দিতে হইল। অল্পক্ষণ পরেই আমরা নাসিকে পৌছিব; সেই জন্য শয়ন না করিয়া দুজনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। পার্শ্বস্থ

অন্যান্য আরোহীগণ কেহ অল্প নিদ্রিত, কেহ বা হস্তপদ প্রসারণ করিয়া গভীর নাসিকা গর্জ্জনের সহিত পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে; যেন দারুণ বেহনতের পর আরাম উপভোগ করিতেছে। রাত্রি ২ টা, ৪১ মিনিটের সময় আমরা নাসিকে পৌঁছিলাম।

---

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

## নাসিক।

প্লাটফরমে নামিয়া শীতের মাত্রা যেন আরও অধিকতর বোধ হইতে লাগিল। ষ্টেসন হইতে নাসিক সহর চারি মাইল পথ। এ গভীর রাত্রিতে সহরেরদিকে যাওয়া, বিশেষতঃ নবাগত ব্যক্তির পক্ষে অসুবিধাজনক; কাজেই এখন সহরের দিকে যাওয়ার নাম একবারে ছাড়িয়া দিয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে দুজনে ২য় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়া দুই খানি খাটে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় নিদ্রা। প্রাতে ৫॥ টার সময় ষ্টেসনের একজন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারি কপাট খুলিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া দিল। এ ত নিজের ঘর নয়, যে জাগাইয়া দিলেও উঠি উঠি করিয়াও খানিকটা সময় বিছানায় গড়াগড়ি করিব।

কাজেই এখন বিনা বাক্য ও সময় ব্যয়ে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিছানা পত্র গুছাইয়া ফেলিলাম। সহরের দিকে যাইবার

অভিপ্রায়ে বাহিরে আসিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ঠিকা টাঙ্গা গাড়ি ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর পর্য্যন্ত ঘোড়ার ট্রাম লাইন আছে, তাহাতেও যাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গে লগেজাদি থাকার জন্য টাঙ্গায় যাওয়াই মনস্থ করিয়াছি।

নাসিক হিন্দুর মহাপুণ্যময় তীর্থক্ষেত্র। পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ বনবাসে আসিয়া এই নাসিকেই গোদাবরীনদীতীরে পঞ্চবটী কুঞ্জে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখান হইতেই পাপাত্মা রাবণ মা জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া যায় এখানেই বীরবর লক্ষ্মণ রাবণ-ভগিনী কামুকী সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন। সেই জন্য এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে দলে দলে অনেক পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডারা অন্যান্য যাত্রীদের নিকট যাইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, কিন্তু আমাদিগকে কেহ একটি কথা বলিতেছে না। বুঝিলাম তীর্থস্থানে হ্যাটকোট ধারিদের এই মান। আর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া আমি একজন পাণ্ডাকে সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ও আমাদের পরিচয় দিয়া তীর্থদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া, আমাদিগকে তাঁহার বাটিতে লইয়া যাইবার জন্য, আমাদের টাঙ্গাওয়ালাকে বলিয়া দিলেন। পাণ্ডার নাম—হরিশঙ্কর যোশি আম্বেগার

কানা—গঙ্গা কিনারা, নওয়া দরজা, বাড়ী নং ২২৪৫। এখানে
গাদাবরী নদীকে গঙ্গা বলে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডার
টীতে না থাকিয়া ডাকবাঙ্গলোয় থাকিয়া তাঁহার সাহায্যে
ষ্টব্য যাহা আছে, সব দেখিয়া লইব। কিন্তু ডাক বাঙ্গলোয়
ান আদৌ না থাকায় অগত্যা পাণ্ডা হরিশঙ্করের বাটীতে
াইয়া আশ্রয় লইতে হইল।

তখনও পাণ্ডা ঠাকুর ষ্টেসন হইতে প্রত্যাগমন
বেন নাই দেখিলাম। বাটীতে তাঁহার এক বিধবা
গিনী ও শিশু ভাগিনেয় আছে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের
ত এ সব অঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা নাই।
ত্র ইতর সকল স্ত্রীলোকই প্রকাশ্যভাবে সাধারণের সমক্ষে
নাবৃতমুখে বাহির হয়, এবং নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিয়া
াকে। বিলাসিতার ছায়া পর্য্যন্ত অদ্যাবধি ইহাদিগকে স্পর্শ
রিতে পারে নাই। জাতীয় রীতিনীতি ইহারা এ ঘোর অনু-
রণের কালেও পুরা মাত্রায় বজায় রাখিয়াছে এবং চিরকাল
খিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়। বিলাস-বিষের বীজ কখনও
েশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া অনুমান হয় না। বঙ্গ
হিলাগণের ন্যায় ইহাদের গৃহস্থালীতে আলস্য নাই, নিত্য নূতন
শ-বিন্যাসে মানস নাই, ইহাদের অঙ্গলেম ব্যায়রাম নাই ও
ৌবনে বার্দ্ধক্য নাই। এক অশিতি বর্ষ বয়স্কা মারহাট্টা রমণী
ংশতি বর্ষীয়া বঙ্গ মহিলা অপেক্ষা কর্ম্মক্ষম, সবল ও
ুকায়।

পাণ্ডাজীর ভগিনী আমাদিগকে দেখিয়াই তীর্থদর্শক বলিয়া বুঝিয়াছেন, এবং তাঁহার ভ্রাতার আমরা শীকারলব্ধ তাহাও বুঝিয়াছেন। আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইতে দেখিবা মাত্র তিনি সসম্ভ্রমে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দ্বিতলে লইয়া গিয়া, একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে বসিতে বিছানা পাতিয়া দিলেন। আমরা দুজনে বসিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িতে লাগিলাম, ও নানা রকম গল্প জুড়িয়া দিলাম। ইতিমধ্যে পাণ্ডাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রথমেই নিম্নে তাঁহার ভগিনীর নিকট আমাদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া, পরে আমাদের নিকটে আসিয়া দর্শন দিলেন। পাণ্ডাজী আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলেন। অবিলম্বে আমাদের মুখ প্রক্ষালন জন্য গরম জল আনিয়া দিলেন। আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া মুখহাত ধুইয়া বসিবামাত্র পাণ্ডাজী দুবাটী গরম 'চা' আনিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন। আমরা তৃপ্তির সহিত পান করিলাম। এই সময় পাণ্ডাজীর সহিত ক্ষণকাল আমাদের গল্প হইল; তাহাতে আমাদের বাঙ্গালা দেশের অনেক কথা ছিল এবং তাঁহাদের অঞ্চলেরও ছিল। আমাদের কথাবার্ত্তায় তিনি বেশ সুখী হইলেন বুঝা গেল। ক্ষণেক পর পাণ্ডাজী এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া, আমাদিগকে গোদাবরীতে স্নান ও রামচন্দ্রের কুটীর, পঞ্চবটী ইত্যাদি দর্শন করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই বিলাতি কেতার পোষাক ত্যাগ করিয়া জাতীয় পোষাক

পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলাম। কাজেই বিলম্ব না করিয়া আমরা পাণ্ডাজীর সহিত বহির্গত হইলাম।

এখানকার অধিকাংশ রাস্তার উপর কাঁকরের পরিবর্ত্তে বড় বড় পাথর দিয়া বাঁধান। সব রাস্তাগুলি প্রশস্ত নয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা ও গৃহ সমূহ পরস্পর নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। অট্টালিকার সংখ্যা খুব কম। পাথরের দেওয়াল, তাহার উপর মৃত্তিকা নির্ম্মিত ছাদ, এবং সর্ব্ব উপর তলের ঘরে খোলার ছাউনী।

পাণ্ডাজীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা গোদাবরী নদী অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সহর হইতে রাস্তা ঢালু হইয়া একবারে নদী গর্ভে যাইয়া মিশিয়াছে। গোদাবরীতে যাইয়া দেখিলাম নদীর অভ্যন্তর প্রায় সর্ব্বত্র পাথর দিয়া বাঁধান। মারহাট্টা রমণীগণ সারি সারি বসিয়া কাপড় কাচিতেছে। লোকে লোকারণ্য। কত লোক স্নান করিতেছে, কত লোক রাম-সীতা দর্শন করিতে যাইতেছে, কেহ বা নদী তীরে শ্রাদ্ধাদি করিতেছে। আমরা পাণ্ডাজীর অভিপ্রায়ানুসারে ঘাটে গিয়া স্নান করিলাম। আমরা কেহ শ্রাদ্ধ তর্পণ করিব কিনা, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের দু'জনের মধ্যে আমিই পিতৃ-মাতৃহীন হতভাগ্য। গোদাবরী নীরে স্বর্গীয় পিতৃদেব ও স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। বহুদিন পর আজ পিতামাতার জন্য চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল। তখন মনে হইল পিতা মাতা! আজ আপনারা কোথায়! আজ আপনাদের হতভাগ্য পুত্র ভগবান্ রামচন্দ্রের লীলাভূমি সুদূর

নাসিকে আসিয়া পুণ্যশীলা গোদাবরীর তীরে বসিয়া আপনাদিগের উদ্দেশ্যে পিণ্ড অর্পণ করিতেছে। মনের এই রূপ ভাবান্তর আর একদিন গয়াধামে হইয়াছিল। শ্রাদ্ধান্তে পাণ্ডাজী আমাদিগকে পঞ্চবটী ও রাম সীতার মূর্ত্তি দর্শন করাইতে লইয়া চলিলেন। গোদাবরী ঘাট হইতে পঞ্চবটী অতি নিকট—৫ মিনিটের পথ। আমরা পঞ্চবটীতলে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম পঞ্চবটী পাঁচটী প্রাচীন বটবৃক্ষের সমষ্টী মাত্র। বটবৃক্ষ পাঁচটী দেখিলে মনে হয় ইহারা যে বহু পুরাতন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তবে ইহার প্রত্নতত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে যে না পারে এমন নহে। সে বিষয়ের মীমাংসা স্বয়ং লীলাময় রামচন্দ্র যিনি ঐ স্থানে লীলা করিয়া গিয়াছেন তিনি ভিন্ন কে করিতে পারে? ফলতঃ পঞ্চবটীর বিবরণ যেরূপ রামায়ণ ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে তাহার সহিত কিছুই পার্থক্য নাই দেখিলাম। সে যাহা হউক, পঞ্চবটীতলে উপস্থিত হইয়া আমি যেন পলকে পলকে আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলাম। আনন্দে মন আপ্লুত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, যদি এটি সত্যই ভগবান্ রামচন্দ্রের লীলাভূমি পঞ্চবটী হয়, তাহা হইলে আমি নিজকে মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি; কেননা, আমার মত নরাধমের এ মহাপূণ্যময় স্থানে প্রবেশ অধিকার বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

পঞ্চবটীর দক্ষিণ পার্শ্বে রামচন্দ্রের মন্দির। মন্দির বলিয়া

বলিলাম বটে, কিন্তু ঘরটী মন্দিরের অনুরূপ নয়। ইহা একটি সাধারণ ইষ্টক নির্ম্মিত ছাদওয়ালা ঘর। এই ঘরের মধ্যে রামসীতার মূর্ত্তি আছে। ঘরটীর বাহ্যদৃশ্য দেখিয়া প্রথমে আমার মন আকৃষ্ট হইল না। সে যাহা হউক পাণ্ডাজীর সহিত মন্দিরের বারান্দায় উঠিবা মাত্র, মন্দিরের ভিতর হইতে একজন যুবক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমরা রামসীতা দর্শন করিব কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা দর্শনাভিলাষ প্রকাশ করিলে পর, যুবক তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং তাহার পশ্চাৎ অনুগমন করিতে বলিয়া তিনি মন্দিরের পশ্চাৎদিকের দেওয়ালস্থিত গবাক্ষের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র ৩ ফুট উচ্চ দরজা পার হইয়া সিড়ি বহিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহার পশ্চাৎ আমি ও আমার পশ্চাৎ সতিষ ভায়া অবতরণ করিতে লাগিলাম! এই সিড়িপথ এত সঙ্কীর্ণ ও উচ্চতায় কম যে দাঁড়াইয়া নামা যায় না। কাজেই বসিয়া বসিয়া সেই অন্ধকারময় সিড়ি দিয়া নামিয়া ক্রমে নিম্নে একটী প্রকোষ্ঠে যাইয়া উপনীত হইলাম। পূজারী ব্রাহ্মণ যুবক অভ্যস্থ বলিয়া তিনি আমাদের বহু পূর্ব্বেই পৌছিয়াছেন। তিনি পৌছিয়া আমাদিগকে ডাকিতেছেন, আমরা তাঁহার গলার স্বর শুনিতেছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমরা ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়াছি, যেন হাঁপ বোধ হইতেছে।

এই প্রকোষ্টটী অতি জরাজীর্ণ; কাঁকর, টুকরা পাথর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত দেওয়াল দ্বারা নির্ম্মিত। কোন কালের যে প্রস্তুত

তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে, ইহাই রাম চন্দ্রের আদিম পর্ণকুটীর। তিনি বনবাসকালে মা জানকী ও লক্ষণ সহ এখানে অবস্থান করিতেন। বিশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ১০৮০ বৎসর হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে রামচন্দ্র ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালের কুটীর অদ্যাবধি বর্ত্তমান থাকা অসম্ভব ব্যাপার বটে, তবে ইহা যে অতি প্রাচীন তাহাও নিঃশঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

কুটীরের মধ্যে এক পার্শে একটী প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। সম্মুখে রামসীতার পাষাণময় সজ্জিত প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান ভাবে বিরাজিত। মূর্ত্তি উর্দ্ধে আড়াই হাতের অধিক হইবেনা।

কুটীরের পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালে একটী ছোট দরজা আছে; এই দরজা দিয়া আরও নিম্নে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারময় সিড়ি বাহিয়া আবার প্রায় ১০।১২ ফুট নিম্নে আর একটী অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে নামিতে হয়। সেখানে এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। কথিত আছে রামজায়া জানকীদেবী এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া প্রত্যহ পূজা করিতেন। এ কুটীরে নামিতে হইলে পূর্ব্বের মত বসিয়াও নামা দুঃসাধ্য; প্রায় চিৎ হইয়া পৃষ্ঠদেশের উপর ভর দিয়া নামিতে হয়।

এই প্রাচীন কুটীর দুটী হিন্দুদের পৌরানিক কীর্ত্তিস্তম্ভ। সেই জন্য ইহাদের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক ও প্রস্তরের পাকা দেওয়াল দিয়া ইহা-দিগকে সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। ইহা যার পর নাই সুখের বিষয়। রাম সীতা দর্শন শেষ হইলে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম।

বাহিরে আসিয়া দু'জনে এই বিষয় অনেক আলোচনা করিতে লাগিলাম।

আমরা যে সময় গিয়াছিলাম সে সময় গোদাবরীতে জল ও স্রোত বেশী ছিল না। পাঠক! একবার মানসপটে গোদাবরী ও পঞ্চবটীর পুরাকালের চিত্র অঙ্কন করিয়া আজকালকার চিত্রের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন; তাহাহইলে দেখিবেন এখন আকাশ পাতাল কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কোথায় সেই হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ গহন কানন, কোথায় বা গোদাবরী তীরে কমল কানন! এখন সেই স্থানে বৈজয়ন্ত ধাম ও বিলাসের প্রমোদ উদ্যান। আজ আমরা সেই পুণ্যময় পঞ্চবটীর তলে পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের কুটীর দ্বারে দণ্ডায়মান। এই পবিত্র স্থান হইতেই পাপাত্মা দশানন মা জানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। রামচন্দ্র মায়া মৃগ বধ করিয়া আসিয়া শূন্য কুটীর দেখিয়া এই স্থানে কত বিলাপ করিয়াছিলেন—

"গোদাবরী তীরে আছে কমল-কানন।
তাথ কি কমলমুখী করিছে ভ্রমণ॥

* * *

জানি আমি পঞ্চবটী তুমি পুণ্য স্থান।
তুমি কি লুকালে মোর জানকী-জীবন॥"

এখান হইতে বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডাজীর অনুগ্রহে তৃপ্তির সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করা গেল। এ দিন আমরা দু'জন ছাড়া আর দুইটী মান্দ্রাজী ভদ্রলোক পাণ্ডাজীর বাটীতে

তীর্থ-দর্শক অতিথিও উপস্থিত। সকলে একত্রে আহারাদি সমাধা করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিলাম। তারপর বেলা ২টার সময় যে স্থানে রামানুজ লক্ষণ সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন সেই স্থান দর্শন করিবার জন্ত একখানি টাঙ্গা করিয়া পাণ্ডাজির সহিত বহির্গত হইলাম। নাসিক সহর হইতে এ স্থানটী প্রায় দুই মাইল পথ। আমাদের টাঙ্গা আস্তে আস্তে এই অল্প পথ অতিক্রম করিয়া এক আঙ্গুর বাগানের পার্শ্বে যাইয়া থামিল। এখান হইতে আমাদের দ্রষ্টব্য স্থান ১০ মিনিটের পথ। এই রাস্তা টুক গাড়ী যাতায়াতের অনুপযোগী; কাজেই আমাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইল। উপস্থিত হইয়া, পুরাণ-বর্ণিত নয়ন-মন-রঞ্জক শ্যামল দুর্ব্বাদল পরিপূর্ণ সুদূরব্যাপী সুরম্য উপত্যকা দর্শন করিয়া প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার হইল। ইহা যে মৃগগণের বিচরণের উপযুক্ত স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সন্নিকটে কপিলা নামে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর তীরে একস্থানে বীরবর লক্ষণ পাপিয়সী সূর্পনখার অসিদ্বারা নাসিকাচ্ছেদন করিতেছেন তাহার পাষাণমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। এখানেও কয়েক জন পাণ্ডা বসিয়া আছেন; কাজেই দর্শকগণকে এখানেও দু চারি পয়সা খরচ করিতে হয়। উপত্যকার একদিকে এক গুহায় একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন দেখিলাম। পাশে আরও ৫।৬টী শূন্য গুহা রহিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ এদিক ওদিক বিচরণ করিয়া অন্তরে যে কি অনুপম আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এমন

মনোরম স্থান বলিয়াই বোধ হয় মায়বী সূর্পনখা স্নিগ্ধ সমীর সেবন জন্য এখানে নিত্য আসা যাওয়া করিত। মানব-কর-প্রসূত শিল্প কলার সৌন্দর্য্য যেমন করিয়াই সুচারু করা হউক না কেন, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশির সহিত তাহার কিছুতেই তুলনা হয় না।

কপিল নদীর স্রোত এক স্থানে ১২।১৪ ফিট নিম্নে বেগে পড়িতেছে। সেইস্থানে একটী কলে আটা প্রস্তুত হইতেছে। স্রোতের সাহায্যে কলের চাকা ঘুরিয়া কল চলিতেছে।

এখান হইতে আমাদের টাঙ্গার নিকট ফিরিয়া আসিলাম। এবার আমরা বাসায় ফিরিতেছি। পথে অনেক দেবালয় দেখিতে দেখিতে আসিলাম। এক মন্দিরে পবন-তনয় হনুমানের বিরাট পাষাণময় কলেবর দর্শন করিলাম। এখানেও কিঞ্চিৎ প্রণামী দিতে হইল। সন্ধ্যার অত্যল্প পূর্ব্বে আমরা বাসায় পৌছিলাম।

আজ আমরা সন্ধ্যা ৬টা ৫৪ মিনিটের ট্রেনে নাসিক ত্যাগ করিব স্থির আছে। কাজেই আমাদের জিনিষ-পত্র সব গুছাইয়া ফেলিলাম। ঐ টাঙ্গাতেই ষ্টেসন যাইব স্থির করিয়া টাঙ্গাওয়ালাকে তখন বিদায় করি নাই। পাণ্ডাজী ইতিমধ্যে একখানি রেকাবে করিয়া সিন্দুর, ফুল, চন্দন ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ লইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন। সামাজিক লৌকিকতার অনুরোধে আমরা কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিলাম, ও পাণ্ডাজীকে দুইটী টাকা দিয়া প্রণাম করিলাম। পাণ্ডাজী সাতিশয় প্রীত হইলেন পাণ্ডাজীর বিধবা ভগিনীর একটী শিশু সন্তান আছে; বিদায়কালে

শিশুটীর হাতে এক টাকা দিলাম। ইহাতে তাহার মাতার আহ্লাদের সীমা রহিল না।

পাণ্ডাজীর বাটী হইতে বিদায় হইয়া ষ্টেসনাভিমুখে রওনা হইলাম। আমাদিগকে ষ্টেসন পর্য্যন্ত পৌছিয়া দিবার জন্য পাণ্ডাজীও আমাদের সঙ্গে টাঙ্গায় আরোহণ করিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম। পাণ্ডাজী টাঙ্গা হইতে ষ্টেসন প্লাটফরমে আমাদের জিনিষ পত্র রাখিয়া দিবার বন্দবস্ত করিয়া দিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় লইলেন। পাণ্ডাজী ব্যবসাদার হইলেও যে অতিশয় বিনয়ী ও ভদ্র তাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছিলাম। জগতে জীব মাত্রেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা তৎপর একথা ধ্রুব সত্য। যাহারা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যের স্বার্থ বা মনুষ্যত্বের দিকে ভ্রমেও চাহিয়া দেখিতে পারেন না তাহারা মনুষ্য নামের অযোগ্য ও সংসারের আবর্জ্জনা মাত্র। পাণ্ডাজীর স্বার্থের সহিত মনুষ্যত্ব যথেষ্ট পরিপুষ্ট আছে।

ক্রমে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সমাগম হইল; ষ্টেসন আলোকমালায় সজ্জিত হইল। যথা সময়ে গাড়ী আসিয়া হাজির হইল। আমরা আজ এখান হইতে ইলোরা গহ্বর দেখিতে যাইব। এখান হইতে আমাদিগকে মনমাদ জংসনে যাইয়া গাড়ী বদল করিয়া নিজাম বাহাদুরের রেল লাইন দিয়া দৌলতাবাদ ষ্টেসনে নামিতে হইবে; এবং দৌলতাবাদ হইতে টাঙ্গা বা শকটারোহণে ইলোরা যাইতে হইবে। সুতরাং আমরা দুখানি মনমাদের টিকিট কিনিয়া

গাড়ীতে উঠিলাম। ট্রেন খানির নাম মনমাদ—একস্‌প্রেস্‌ (Manmad Express)। নাসিক হইতে মনমাদ ৪৫ মাইল পথ। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা মনমাদ যাইয়া পৌছিব। এই অত্যল্প সময় নিদ্রার উপযুক্ত নয় বলিয়া দুজনে বসিয়া গল্প করিয়া সময় অতিবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে নাসিক ও পুনা সহর দ্বয়ের সমালোচনা আরম্ভ করা গেল।

আমাদের ধারণা ছিল পুনা সহর খুব জাঁকাল ও প্রায় বোম্বের সমতুল্য; কিন্তু চাক্ষস দেখিয়া সে ধারণা অন্তর্হিত হইল। এমন কি নাসিক অপেক্ষাও ছোট ও কতকাংশে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। আয়াতনে নাসিক, পুনাপেক্ষা বড় ও লোক সংখ্যাও অধিক। নাসিকে দোকান পশার বিস্তর আছে। এখানকার পিতলের বাসনের কারবার চির-প্রসিদ্ধ। সহরের মধ্যে রেল কোম্পানির এক শাখা টিকিট ঘর (Branch Booking Office) আছে। নাসিকের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। বায়ু পরিবর্ত্তনের অতি উত্তম স্থান। ষ্টেসন হইতে সহরে যাইবার রাস্তার ধারে নাসিক স্বাস্থ্য-নিবাস (Sanitorium) অবস্থিত। খাদ্য দ্রব্য এখানে সব রকম পাওয়া যায় এবং তাহা মহার্ঘও নয়। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে মনমাদ হইতে নিজাম বাহাদুরের রেল লাইন হায়দারাবাদ পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে।

যথাসময়ে আমরা মনমাদ জংসনে আসিয়া পৌছিলাম। তখন রাত্রি আট টা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়াছে। মনমাদ প্রকাণ্ড ষ্টেসন। এখানে ৪টী প্লাটফরম। কোনদিকে দ্বিতীয়

শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগার তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করা নবাগত যাত্রীর পক্ষে কষ্টসাধ্য। যাহা হউক জিজ্ঞাসাবাদে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারের সন্ধান লইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে আমরা ইলোরা গহ্বর দেখিতে যাইব। মনমাদ হইতে রাত্রি ২টা ৩০ মিনিটের সময় হায়দারাবাদ দিকে যে গাড়ি যায় তাহাতে আমরা যাইব স্থির আছে; আহারাদি সমাধা করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম মানসে শয্যা বিস্তার করিয়া শয়ন করিলাম। গাড়ী ছাড়িবার সময় আমাদিগকে জাগাইয়া দিবার জন্য কুলিকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি। মধ্য রাত্রিতে কোথাও যাইবার বন্দোবস্ত থাকিলে নিদ্রা নিশ্চিন্তভাবে হওয়া অসম্ভব, কাজেই কোনও রকমে গড়াগড়ি দিয়া এই সময়টুকু কাটাইলাম। যথা সময়ে কুলিরা আসিয়া আমাদিগকে জাগাইল। পূর্ব্বেই আমরা টিকিট খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলাম। বিছানা পত্র বাঁধিয়া লইয়া আস্তে আস্তে যাইয়া গাড়িতে উঠিলাম। এই রেলওয়ের নাম হায়দারাবাদ-গোদাবরী-ভ্যালী রেলওয়ে (Hyderabad-Godvary Valley Ry.)। ইহা মিটার গেজ (Metere Gauge) রেলওয়ে।

যে দুইটী রেল লাইনের উপর দিয়া ট্রেন যাতায়াত করে তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তাহার নাম গেজ (Gauge)। ঐ প্রকার ব্যবধানের ৪ রকম রেললাইন সাধারণতঃ আছে। প্রথমতঃ ব্রড্ গেজ (Broad Gauge); ইহার ব্যবধান ৬ ফুট, ৬ ইঞ্চি। তারপর মিটার গেজ (Metre Gauge); ইহার ৩ ফুট ৬ইঞ্চ ব্যবধান। তারপর ন্যারো গেজ (Narrow Gauge);

ইহার ব্যাবধান ২ ফুট ৬ ইঞ্চ। তারপর লাইট রেলওয়ে (Light Railway); ইহার ব্যাবধান ২ ফুট মাত্র। এই সকল ব্যাবধানের মাপ অনুসারে ইহাদের উপর দিয়া যাতায়াতের উপযোগী গাড়ি সকলও ছোট বড় আকারের হইয়া থাকে।

দৌলতাবাদের পূর্ব্বে ইলোরা-রোড ষ্টেসন। সেখান হইতেও ইলোরা গহ্বর যাওয়া যায়। কিন্তু সেখান হইতে ইলোরা গহ্বর একটু বেশী দূর ও পথ ভাল নয়। দৌলতাবাদ হইতে ইলোরা গহ্বর পর্য্যন্ত পাবলিক ওয়ার্কসের বাঁধা রাস্তা আছে। ইলোরা রোড ষ্টেসন পার হইবার সময় দেখিলাম তথায় প্লাটফরমের নাম বোর্ডের নিম্নে বৃহৎ অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা আছে "Alight here for Ellora Caves" অর্থাৎ "ইলোরা গহ্বর যাইবার জন্ত এখানে অবতরণ কর"। বলিতে পারি না, কেন যে ওখানে এ কথা লেখা আছে। দৌলতাবাদে বরং লিখিয়া দেওয়া উচিৎ ছিল।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

## দৌলতাবাদ।

### ইলোরা।

আমরা প্রাতঃকাল ৭টার সময় দৌলতাবাদে পৌছিলাম। গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া আমাদের বিছানাদি কুলি দ্বারা নামাইয়া লইয়া বিশ্রামাগার দিকে যাইয়া ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত আলাপ পরিচয় করিলাম। তিনি আমাদের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগার খুলিয়া দিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম লোকটী অতি ভদ্রও মিষ্টভাষী; নাম D. Thomas, একজন দেশীয় খৃষ্টান। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া তিনি বলিলেন "আমাকে মনমাদ হইতে তারযোগে আপনাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে ইলোরা যাইবার জন্য আমি টাঙ্গার বন্দবস্ত করিয়া রাখিতাম; যাহা হউক দেখি, চেষ্টা করিয়া যদি যোগাড় করিয়া দিতে পারি"। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে পুলিষের জমাদারকে ডাকিয়া

সমস্ত বলিলেন। ইহারা নিজাম বাহাদুরের ষ্টেট-পুলিষ। পুলিশ-জমাদারটীও ভদ্রতার সহিত আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া টাঙ্গার জন্য চেষ্টা করিতে গেল। ইত্যবসরে আমরা মুখ হাত ধুইয়া জলযোগাদি ক্রিয়া সারিয়া লইলাম। সৌভাগ্যবশতঃ ষ্টেসন মাষ্টার সাহেবের চেষ্টায় অল্পক্ষণ মধ্যেই একখানি গরুর টাঙ্গা মিলিল। নামে টাঙ্গা, কাজে গরুর গাড়ি অপেক্ষা কোন অংশে উত্তম নয়। গাড়ি খানির চেহারা টাঙ্গা গাড়ির মত দেখিতে বটে, কিন্তু তাহার স্প্রীং (Spring) না থাকার জন্য গরুর গাড়িতে চাপিয়া গেলে যে আরাম উপভোগ হয় ইহাতেও সেই আরাম। যে রকমই হউক তখনি যে একখানি যেমন তেমন গাড়ি পাওয়া গিয়াছে ইহাই যথেষ্ট। কারণ সেই দিনই আমাদের দৌলতাবাদ ত্যাগ করিবার স্থির আছে; গাড়ি না পাওয়া গেলে সেই রাত্রি তথায় অবস্থানজনিত কষ্টভোগ ভাগ্যে ঘটিবে সেই আশঙ্কা ছিল। টাঙ্গা প্রস্তুত শুনিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের জিনিষ পত্র ষ্টেসন মাষ্টারের সম্মুখে পুলিষের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ইলোরা রওনা হইলাম।

ষ্টেসন হইতে ২।৩মাইল আন্দাজ পথ যাইবার পর রোজা নামক গ্রামে পৌছিলাম। রোজা গ্রামে এক পাহাড়ের উপর একটী প্রাচীনদুর্গ আছে। পাহাড়টীকে গোল বৃত্তাকারে কাটিয়া তাহার উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে। বহুদূর হইতে ট্রেনে বসিয়া এই দুর্গ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। রোজা গ্রামখানি আয়তনে প্রায় ৩ মাইল। গ্রামের চতুর্দ্দিক প্রস্তরময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ও দুইদিকে দুই বৃহৎ প্রবেশদ্বার। পাবলিক ওয়ার্কসের পথ ষ্টেসন হইতে

বাহির হইয়া রোজা গ্রামের মধ্য দিয়া বরাবর চলিয়াগিয়াছে। আমাদের টাঙ্গা রোজার ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর অভ্যন্তরস্থ স্থান ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। অদূরে পর্ব্বতোপরি দুর্গ মস্তকে উড্ডীয়মান পতাকা লইয়া ভারতের অতীত বীরত্ব-গৌরব ঘোষনা করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ছোট বড় প্রস্তরময় বহু অট্টালিকা কেহ ভগ্ন, কেহবা অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় লতা গুল্মের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাসে পরিণত হইয়াছে। এক জায়গায় মান মন্দির একটী আছে। এটী যেন নূতন প্রস্তুত বলিয়া মনে হইল; বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহার জীর্ণ সংস্কার হওয়ায় ইহা নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। প্রাচিরের অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপ পরিপূর্ণ জঙ্গলে আবৃত।

ক্রমে আমরা রোজার সীমা অতিক্রম করিয়া অন্যদিকের প্রবেশ দ্বার পার হইয়া গ্রামের বাহিরে আসিলাম। এইবার কিয়দ্দূর পরেই পথের উচ্চতা ও নিম্নতা বেশ উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। গরুর গাড়িতে সমতল জমীর উপর যাইতেই কত কষ্টবোধ হয়। এ রকম উচ্চনিচ প্রস্তরময় রাস্তায় প্রত্যেক মাইলে তিন চারিবার উঠা নামা যে কি কষ্টকর, তাহা পাঠক! যদি কখনও ভুগিয়া থাকেন তবে এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই ভাবে দুই তিন মাইল পথ অগ্রসর হইবার পর আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ বেশ বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। সময় সময় বমনের বেগ আসিতে লাগিল। অনেক কষ্টে বমনের বেগ সহ্য করিয়া লইলাম। স্থানে স্থানে গাড়ি এরূপ ধাপিয়া উঠিতেছে, যেন হৃৎপিণ্ড

বন্ধ হইবার উপক্রম। সে সময় একটুকু অসাবধান হইলে সহসা জিহ্বা বা ওষ্ঠ কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাহাদের শারিরিক দৌর্ব্বলতা অধিক তাহাদের বিশেষতঃ এ পথে এ ভাবে আসা অশ্রেয়। কোথাও কোথাও পথ এক মাইল দেড় মাইল এত ঢালু হইয়া চলিয়া গিয়াছে যে, সে স্থানে আরোহীগণকে টাঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাইতে হয় এবং গরু ও টাঙ্গা আস্তে আস্তে ধরিয়া নামাইতে হয়। আমাদিগকে দুই তিন জায়গায় এইরূপে নামিতে হইয়াছিল। কতকদূর যাইবার পর এক জায়গায় আসিয়া আমাদের টাঙ্গা থামিল। সেখানে নিজাম বাহাদুরের পাবলিক ওয়ার্কসের ডাক-বাঙ্গলো আছে। পথিকগণ ইচ্ছা করিলে সেখানে থাকিতে পারেন। এস্থান হইতে ইলোরা গহ্বর এক মাইল পথ। এখান হইতে গহ্বর পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে হয়। এই এক মাইল পথ এত ঢালু যে, কোনও রকমেই টাঙ্গা এ পথে যাইতে পারে না। আমাদের টাঙ্গাওয়ালার মুখে এ সমস্ত শুনিয়া আমরা টাঙ্গা হইতে অবতরণ করিয়া অগত্যা পদব্রজে রওনা হইলাম।

তখন বেলা ১০টা বাজিয়াছে। রৌদ্র বেশ খরতর বেগ ধারণ করিয়া উঠিতেছে। সম্মুখে এক গভীর জঙ্গলাবৃত পর্ব্বত এবং সেই পর্ব্বতের পার্শ্ব-দেশ দিয়া পবলিক ওয়ার্কসের পথটী পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া গহ্বরের সম্মুখে যাইয়া পৌছিয়াছে। আমরা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছি কিন্তু ইলোরা গুহার চিহ্ন কোথায় তখনও দৃষ্টিগোচর হইতেছেনা। ক্রমে পর্ব্বতের পাদদেশে একখানি ঘরের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘরটী পুলিষের

ফাঁড়ি। এখানে একজন জমাদার ও এক পাণ্ডা আছেন। পাণ্ডা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রধান গুহাভিমুখে চলিল। আমরা তাহার অনুগমন করিতে লাগিলাম। এই গুহার নাম কৈলাস। ইলোরা পর্ব্বতের মধ্যে যতগুলি গুহা আছে, তন্মধ্যে কৈলাস সর্ব্বপ্রধান এবং ইহার জন্যই ইলোরার নাম জগদ্বিখ্যাত। বোম্বাইএ এলিফাণ্টা গুহা দেখিয়া কিরূপ বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। তখন ভাবিয়াছিলাম, ইলোরা গুহা যখন পৃথিবীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য পদার্থ, তখন তাহা দেখিলে না জানি আরও কত অধিক বিস্ময়কর বোধ হইবে। যে অদ্ভুত জিনিষ দেখিয়া সাধ মিটাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কতকাল হইতে অন্তরে জাগিতেছিল, আজ সেই জিনিষের সমীপে আমরা উপনীত। আজ সেই বহুদিনের পোষিতআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।

নিজাম বাহাদুরের ডাক বাঙ্গলোর অত্যল্প দূর হইতে আরম্ভ হইয়া চারি মাইল আন্দাজ লম্বা ভাবে ইলোরা পাহাড় গিয়াছে। পাহাড়ের উপর হিংস্র জন্তু সমাকুল ভীষণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল, এবং অভ্যন্তরে প্রস্তরখোদিত অদ্ভুত গুহা। গুহার প্রবেশ দ্বারে যাইয়া পৌছিবার পূর্ব্বে দূর হইতে এই অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যের অস্তিত্ব ও বিশেষত্ব ধারণা করা অসম্ভব। যতই আমরা গুহার নিকটস্থ হইতেছি ততই আমাদের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। এখন এক মিনিটের জন্যও অপেক্ষা করা বিরক্তকর বোধ হইতেছে।

প্রথমে আমরা প্রধান ফটক বা প্রধান প্রবেশ দ্বার পার হইলাম।

এই প্রবেশ দ্বারের নাম গোপুর। ইহা উর্দ্ধে ৫০ ফুটের কম নহে। প্রবেশ পথ, তিনখানি গাড়ি পাশাপাশি যাতায়াতের উপযুক্ত প্রশস্ত। উপরে নহবত খানা ও পার্শ্বে মান মন্দির। পাহাড়টি পাট্‌কিলে রঙ্গের শক্ত জমাট পাথরের। পাথর খুদিয়া পাহাড় ভেদ করিয়া প্রবেশ দ্বার, মান মন্দির ও নহবতখানা প্রস্তুত করিয়াছে। খোদাই করিয়া বাহির করা বলিয়া যে, যেমন তেমন করিয়া যাতায়াতের উপযোগী কোনও রকম একটা পথ করিয়া লইয়াছে তাহা নহে। ছোট বড় থাম, কার্নিব থিলান, নানাবিধ চিত্র প্রভৃতি যেখানে যেমনটি করিলে ফটকের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় সেই রকম করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই দেখিলাম। প্রত্যেকটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল আমরা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গোপুর পার হইয়া আমরা এক সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে চারিশত ফিট, ও প্রস্থে তিনশত ফিটের কম নহে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে শিব মন্দির। মন্দিরের মাপ ২৬ বর্গ ফিট। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ অদ্যাবধি বিরাজমান আছেন, এবং বরাবর থাকিবেন, কারণ ইহাঁকে স্থানান্তর হইতে আনিয়া স্থাপন করা হয় নাই। ইহাঁকেও মন্দিরের সহিত পাহাড় হইতে খোদাই করিয়া বাহির করা হইয়াছে। সমগ্র মন্দির ও শিবলিঙ্গ একখানি বিশাল অখণ্ড প্রস্তর হইতে খোদিত। মন্দিরটি চূড়া বিশিষ্ট; অনেকটা আমাদের দেশের রথের সাদৃশ্যে প্রস্তুত। মন্দিরের উপরে উঠিবার সিড়ি আছে।

শিবমন্দিরের উত্তর দিকে এবং অব্যবহিত পার্শ্বেই প্রাঙ্গণের উপর ৪৫ ফিট উচ্চ, চতুষ্কোণ আকারের একটি মঞ্চ আছে। ইহা দীপদান নামে কথিত। ইহার উপর তৎকালে প্রদীপ জ্বালা হইত শুনিলাম। এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য; কারণ উপরিভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত মঞ্চের গাত্রে তৈল বা ঘৃতের রেখা-বিশিষ্ট চিহ্ন সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, স্পষ্ট দেখা গেল। তৈল বা ঘৃতের দাগ কোনও স্থানে লাগিলে বহুকাল যাবৎ বর্ত্তমান থাকে ; রৌদ্র বা বৃষ্টিতে লয় হয় না।

গোপুরের দুই পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের আকারে শ্রেণীবদ্ধ অনেকগুলি ছোট ছোট ত্রিতল প্রকোষ্ঠ আছে। এ প্রকোষ্ঠ সকল সৈন্য বা প্রহরীগণের আবাসস্থান বলিয়া অনুমান হয়; প্রদর্শক পাণ্ডাও আমাদের অনুমানের সমর্থন করিল।

শিবমন্দিরের পশ্চাৎদিকে এক ত্রিতল প্রাসাদ বা দেবালয়। অতঃপর আমরা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে টানা লম্বা বারান্দা এবং তার পর সুবৃহৎ হল। হলটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা। ২৭৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৫৪ ফুট প্রশস্থ। বারান্দা ও হলের উপর অনেকগুলি চতুষ্কোণ থাম দ্বারা সুরক্ষিত ছাদ, এবং আশে পাশে বিভিন্ন আকারের অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। কোনও প্রকোষ্ঠ এরূপ নিভৃত, যে সহজে তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করা দুরূহ; এতদ্ব্যতীত সেগুলি পরস্পরের সহিত এরূপ জটীল ভাবে সংলগ্ন যে, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া সেই

পথে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য। হলের দুই পার্শ্বে দ্বিতলে ও ত্রিতলে উঠিবার সিড়ি আছে। সিড়ি দিয়া আমরা ক্রমান্বয়ে দ্বিতলে ও ত্রিতলে উঠিয়া এক এক করিয়া চতুর্দ্দিকে যাবতীয় দ্রব্য পর্য্যাবেক্ষণ করিলাম। তিনতলেই হলের পশ্চাদ্দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন এক এক বিরাট প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। যদিও ইহারা কোনও দেবতাবিশেষের মূর্ত্তির অনুরূপ নহে, তথাপি ইহদিগকে দেবতা বোধে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইত, তাহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া গেল।

খণ্ড খণ্ড প্রস্তর বা ইষ্টক সমষ্টী দ্বারা যে প্রণালীতে সাধারণ অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে, এ সকল ঘরের স্থপতি প্রণালী সে প্রকার নহে। এখানে গাঁথুনির নাম গন্ধ নাই; কেবল খোদাই কার্য্য; এমন একটি জিনিষ এখানে দেখিতে পাইলাম না যে, তাহাতে দুইখানি প্রস্তরের একত্র সংযোগ আছে। গোপুর বা প্রধান প্রবেশ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাসাদের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গুহাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক জিনিষটি এক অখণ্ড পাহাড় কাটিয়া খোদাই করিয়া বাহির করা। ছাদে যে সমস্ত কড়ি ও বরগা দেখা গেল তাহা সহসা দেখিলেই পৃথক প্রস্তুত করিয়া সাধারণ অট্টালিকার ন্যায় এখানেও সংলগ্ন করা বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; এ সকলও খোদাই করিয়া বাহির করা। প্রত্যেক কাজটী এত সরল ও মসৃণ যে ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকাতে সচরাচর ওরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। থামগুলি পরস্পর সমদূরবর্ত্তী ও এক মাপের। হল, বারান্দা ও প্রত্যেক

প্রকোষ্ঠের প্রত্যেক দেওয়ালে বৃহৎ আকারের তিন চারি হস্ত পরিমিত উচ্চ দেবদেবীর সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে খোদিত কত যে প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। মূর্ত্তি সমূহ হিন্দু দেবদেবীর বটে, কিন্তু মস্তক বৌদ্ধ অনুকরণে প্রস্তুত। কোথাও দুর্গার প্রতিমূর্ত্তি,—মা দশভূজা মূর্ত্তিতে মহিষাসুরকে দলন করিতেছেন, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী—সরস্বতী ও কার্ত্তিক—গণেশ বিরাজিত। কোনও স্থানে দেবগণের বিরাট সভা,—তথায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণ সমাসীন। একস্থানে ইন্দ্রের সভা আছে। পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ রামচন্দ্র এক জায়গায় অকাল বোধনে মা ভগবতীর আরাধনা করিতেছেন, এবং এক নীলপদ্মের অভাব হওয়ায় তাহা পূরণ করিবার জন্য নিজের এক চক্ষু ধনুর্ব্বাণ দ্বারা উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই রূপ অসংখ্য পৌরাণিক চিত্রে সমুদায় গুহার দেওয়ালগুলি পরিপূর্ণ।

এই সকল মূর্ত্তির অধিকাংশের নাসিকা কর্ণ; ও হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গা দেখিলাম। অস্ত্রাদির সাহায্যে ভাঙ্গা বলিয়া বোধ হইল। আরঙ্গজিবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের হিন্দু দেবালয় সমূহের উপর এইরূপ বহুবিধ অত্যাচার হইয়াছিল। ইহা তাহারই অন্যতম বলিয়া অনুমান হয়।

প্রত্যেক মূর্ত্তিকে বসনভূষণ প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত করিবার জন্য তাহার উপর কত রকম সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর খোদাইএর শিল্পকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। এক একটি ফল ফুল ও লতা পাতার উপর কত

সুক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম খোদাই করিয়া নানাবিধ অসাধারণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছে তাহা দেখিলে চক্ষু সার্থক হয়। চিত্রকারেরা তুলির সাহায্যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র অঙ্কন করিতে পারে কি না সন্দেহ।

লোকালয়ের অন্তরালে, নির্জ্জন প্রান্তরে, পর্ব্বতাভ্যন্তরে খোদিত এরূপ অলৌকিক সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণে না জানি কি অসাধারণ শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল! যিনি করিয়াছেন তাঁহার ক্ষমতাকে ধন্য! তিনি নর হইলেও নরাকারে দেব। দেবতা বা দেবশক্তি সম্পন্ন মাহাত্মা ব্যতীত কে এমন আমানুষিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম! বর্ত্তমান কালের প্রস্তুত এমন কোনও অট্টালিকা দৃষ্টি গোচর হয় নাই, যে তাহাকে এই গুহার সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। গুহাভ্যন্তরে উপস্থিত হইয়া পুরাকালের এই অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ অবলোকন করিবামাত্র মনে হইতে লাগিল, প্রকৃত কি ইহা দেবাদিদেব মহাদেবের সেই বিলাস বর্জ্জিত পরম পবিত্র যোগাশ্রম কৈলাস ভবন! আমরা অতীত জন্মের মহাপুণ্যবলে আজ এখানে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছি। যেন দেব, আমাদের ন্যায় পাপাত্মাদের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া পার্ব্বতিসহ সহসা অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। নতুবা ইহা সুরপুরী! সুরেরাজ সুরবালা গণসহ, যেন এই বৈজয়ন্তপুরী পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন, এবং পরিত্যক্তাপুরী নিরালঙ্কারা বিধবাসুন্দরীর ন্যায় বিষণ্নমনে দাঁড়াইয়া ইঙ্গিতে নিজের বিষাদগাথা জ্ঞাপন করিতেছে। বা, ইহা আরব্য উপন্যাসের গল্প আমাদের

চক্ষের সমক্ষে সত্য ঘটনায় পরিণত হইল! না, আমরা নিদ্রাবশে স্বপ্নদর্শন করিতেছি! অনেক অসাধারণ অট্টালিকা দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অসাধারণত্ব কোথাও ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

চতুর্দ্দিক পরিদর্শন করিয়া প্রাণে আনন্দ ও নিরানন্দের উৎস যুগপৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। পুরাকালে ঋষি তপস্বীগণ নগরের জনতা ও কোলাহল হইতে বহুদূরে মনুষ্য সমাগম শূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে গিরিগুহা প্রস্তুত করিয়া তথায় ঐশ্বরিক চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া কিরূপে জীবনের মহাব্রত উদ্যাপন করিতেন তাহা এই সমস্ত গুহা হইতে বেশ প্রতিপন্ন হয়। এ সকল স্থান শান্তির প্রশস্ত নিকেতন; চিত্ত সংযমের প্রকৃত স্থান। এখানে সংসারের বিভীষিকার কল্পনা পর্য্যন্ত স্থান পায় না। না জানি এক সময়ে এই পরম পবিত্র প্রাসাদে কত সাধু পুরুষের সমাগম হইত। দেবার্চ্চনার মন্ত্রোচ্চারণে সন্নিকটস্থ সমগ্র পর্ব্বতমালা প্রতি-ধ্বনিত হইত! শংখের সুমধুর নিনাদ সুদূর পল্লিবাসীর কর্ণ কুহরে যাইয়া পশিত। সেই সমস্ত কালের করাল কবলে পতিত হইয়া এখন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে; স্মরণচিহ্ন মাত্র পশ্চাতে পড়িয়া আছে। হায়! আজ সেই বিপুল সুরম্য রাজ-প্রাসাদ জন মানব শূন্য; বন্য জন্তুর আবাসে পরিণত। এখন এখানে নিস্তব্ধতার ভয়াবহ দৃশ্য সর্ব্বদা যেন মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ঝিল্লি রব তাহার সহিত যোগ হওয়ায় নিস্তব্ধতার গভীরতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মন্দির গাত্রে পেনশিলে ও চা খড়িতে অনেক দর্শকের নাম

স্বাক্ষর করা আছে দেখিলাম। দুঃখের বিষয় ঐ সকল নামের মধ্যে একটি ব্যতীত বাঙ্গালীর নাম আর খুঁজিয়া পাইলাম না।

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে পুরাকালে কত যে অদ্ভুতকীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাহাদের অনেকের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়া সদাশয় গভর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। বেশ বুঝা যাইতেছে এখনও বহুকীর্ত্তি অরণ্য মধ্যে ও মৃত্তিকাভ্যন্তরে অনাবিষ্কৃত অবস্থায় অজ্ঞাত রহিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চেষ্টা ও যত্নে অধুনা বঙ্গদেশের অনেক পুরাকীর্ত্তি ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে। বিশ্বকোষের সম্পাদক প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। তিনি সমগ্র বঙ্গবাসীর নিকট ধন্যবাদের পাত্র।

ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বম্বে প্রেসিডেন্সিতে, অনেক গুহা দেবালয় আছে, তন্মধ্যে ইলোরার কৈলাস গুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও আশ্চর্য্যজনক। এই জন্য ইহা পৃথিবীস্থ যাবতীয় আশ্চর্য্য পদার্থের অন্যতম বলিয়া বিখ্যাত। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দির মধ্যে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের ক্রমশঃ উত্থান হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় দাক্ষিণাত্যের পরাক্রান্ত চোল রাজগণ কর্ত্তৃক কৈলাস গুহা নির্ম্মিত হয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে, পর্ব্বতের গাত্র খোদাই করিয়া এরূপ অসাধারণ গুহা নির্ম্মিত হয় নাই।

Later on, when Hinduism had completly triumphed over Budhism, the Hindus of southern India excavated in the spot, in the 8th. or 9th. century A. D. the famous temple of Kailash, which has made Ellora one of the great wonders—R. C. Dutt's "Ancient India."

গোপুর পার হইয়া এক জায়গায় পদ্মদলের উপর লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। সন তারিখাদি পদ্মপত্রের উপর খোদিত আছে বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু সে সকল এত অস্পষ্ট যে তাহা বুঝিয়া উঠা দুরূহ। আর এক স্থানে থামের নিম্নদেশে লেখা দৃষ্ট হয়; এগুলিও বেশ স্পষ্ট নয়। প্রত্নতত্ব বিশারদ পণ্ডিত ফাও´সান এই স্থানের লেখা হইতে এই গুহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দিতে প্রস্তুত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পদ্মপত্রের উপরের অস্পষ্ট অক্ষর হইতে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দির আভাস পাইয়াছেন।

Passing the Gapura or gateway the visitor is met by a large Sculpture of Lakshmi seated on lotuses with her attendant elephants. There are some letters and date on the leaves of the lotus on which she sits, but illegible, and probably belonging to the 5th century. On the base of pilasters on each side have been inscriptions in characters of

the 8th Century, but of these only a few letters illegible—Fergussen's "Cave Temples of India."

ফলতঃ কৈলাস গুহা যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দির পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়। তবে ইহা বৌদ্ধদের দ্বারায় প্রস্তুত নহে, হিন্দুদের দ্বারায় প্রস্তুত ইহাও নিশ্চিত। কোন হিন্দু রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে মত ভেদ আছে। J Murdoch তাঁহার "Pictorial tour round India" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—ইলিচপুরের রাজা ইদু ইলোরা পাহাড়ের সন্নিকটস্থ কোনও প্রস্রবণ হইতে জলপান করিয়া এক কঠিন পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করায় কৃতজ্ঞতা চিহ্ন সরূপ কৈলাস গুহা নির্ম্মাণ করিয়ামহাদেবকে অর্পণ করেন।

"At Ellora there are Buddhist, Jain & Hindu temples. Among them is a remarkable temple, called Kailas, cut out of a rock and standing by itself. * * * It is said to have been built about the eighth century by Rajah Edu of Ellichpur, as a thank—offering for a cure effected by the waters of a spring near the place.—*Pictorial Tour round India by J. Murdoch.*

সমস্ত গুহা আদ্যোপান্ত পরিদর্শন শেষ করিতে আমরা পায়ে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম, ও ক্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। অনন্তর এখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা দ্বিতীয় গুহায় প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় গুহার প্রবেশ দ্বারের পরই সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ এবং প্রাঙ্গণের পর কৈলাস গুহার অনুরূপ ত্রিতল দেবালয় বা প্রাসাদ। তবে ইহা কৈলাস অপেক্ষা আকারে কিছু ছোট। প্রথম তলে হলের ভিতর পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে সংলগ্ন বেদীর উপর ১৫ হাত পরিমিত উচ্চ এক বিপুল প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তি। দ্বিতলে ও ত্রিতলে প্রথম তলের মূর্ত্তির শীর্ষ দেশের উপর যথাক্রমে ঐ আকারের আর দুইটি প্রস্তরময় মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে দেখিলাম। প্রথম তলের মূর্ত্তি হনুমানের, দ্বিতলের রামানুজ লক্ষণের ও তৃতীয় তলেরটি রামচন্দ্রের মূর্ত্তি বলিয়া পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম।

এ গুহারও কারুকার্য্যাদি কৈলাস অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। দ্বিতীয় গুহা হইতে বাহির হইয়া আমরা তৃতীয় গুহায় প্রবেশ করিলাম। ইহার নাম বিশ্বকর্ম্মা গুহা। ইহা বৌদ্ধ রাজত্বের শেষাংশে খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দির মধ্যভাগে বৌদ্ধদের দ্বারা খোদিত। ইহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম উপাসনার মন্দির ছিল।

এরূপ মন্দিরকে চৈত্য বলে। আর যেখানে বৌদ্ধ সাধুগণ বাস করিত তাহার নাম বিহার বা মঠ। পূর্ব্বোক্ত গুহাদ্বয় অপেক্ষা বিশ্বকর্ম্মা গুহা কিছু ছোট, কিন্তু ইহার স্থপতি কৌশল অধিকতর বিস্ময়কর। হলের মাপ দৈর্ঘে ৮৫ ফিট এবং প্রস্থে ৪৩ ফিট। দেওয়াল প্রভৃতিতে চিত্রাদি কারুকার্য্য সবই পূর্ব্বোক্ত গুহাদ্বয়ের ন্যায়। এখানে ছাদটিতে কিছু বিশেষত্ব

আছে। ঘোড়ার খুরের আকারের গোলাকার খিলান, এবং তাহাতে তরঙ্গের ন্যায় খোদাই করিয়া অনেক শিল্পকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

The Visvakarma cave of Ellora is a chaitya belonging to the latter part of the Budhist period. The dimensions of the hall are 85ft. by 43ft., and in the roof all the ribs and ornaments are cut in the rock, though still copied from wooden prototypes. In the facade we miss for the first time the horse shoe opening which is the most marked feature in all previous examples.

R. C. Dutt's Ancient India.

ইলোরা পর্ব্বতে এই তিনটী প্রধান গুহা ব্যতীত আরও বিবিধ রকমের ত্রিশটীর অধিক অপেক্ষাকৃত ছোট গুহা আছে। বলিতে গেলে সমস্ত পর্ব্বতটি গুহায় পরিপূর্ণ।

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর ও স্থপতিগণ যে কতদূর অসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই সকল গুহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আগ্রার তাজ মহল, চিনদেশের প্রাচির এবং বর্ত্তমান কালের রেল পথের সেতু ও টনেল প্রভৃতি স্থপতি কার্য্যের যাঁহারা ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি এই সকল গুহা দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, পুরাকালে বিজ্ঞানের চর্চ্চা কত উচ্চ সোপানে

উঠিয়াছিল। এইরূপ গুহাদিতে স্থপতি ও ভাস্কর বিদ্যা যেরূপ অসাধারণভাবে প্রতিফলিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে সহসা ধারণা হয় যেন ইহাতে দৈবশক্তি নিয়োজিত ছিল; মনুষ্য দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কত লোকে কতকাল যাবৎ এরূপ গুহা প্রস্তুত করিতে সক্ষম তাহা সিদ্ধান্ত করা কল্পনার অতীত।

সমস্ত পরিদর্শনান্তে আমরা গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তখন বেলা এগারটা বাজিয়াছে। ক্ষুধা ও পিপাসা বেশ অনুভব করিতেছি। সেই জনমানবশূন্য পর্ব্বতকন্দরে আহার্য্য বস্তু দুষ্প্রাপ্য। কাজেই সে সময় ক্ষুধার তাড়না সহ্য করিতে হইল। আমার পকেটে খান কয়েক মাত্র বিস্কুট ছিল, তাহার দ্বারায় জঠরানল কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিয়া গুহার সম্মুখস্থ ফাঁড়ি ঘরে যাইয়া জল পান করিলাম। শরীর কতকটা শীতল হইল।

এবার উপরদিকে প্রায় দুই মাইল পথ উঠিয়া যাইয়া আমাদের টাঙ্গার নিকট পৌছিতে হইবে। তপন দেব তখন প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পথিকের সহিত প্রাতের সৌখ্যভাব ত্যাগ করিয়া বৈরীভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যাহ্নের তাপ বেগ অবরোধ করা দুর্ব্বল মানবের ক্ষমতাতীত, বিশেষতঃ ক্লান্ত পথিকের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য। আমরা যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে এতটা চড়াই পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। সতীশ ভায়া ত বিলক্ষণ চিন্তিত; একবারেই হাল ছাড়িয়া দিয়া, ঐ পথটুকু

যাইতে কোনও যানবাহন পাওয়া যায় কিনা, তাহার সন্ধান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডার মুখে নিরাশ উত্তর পাইয়া অগত্যা পদব্রজে রওনা হইতে হইল। বিদায়কালে পাণ্ডাকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিলাম। যষ্ঠীর উপর ভর দিয়া ধীরেধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করা গেল। কিয়দ্দূর যাইয়া বেশ মেহনত বোধ হইতে লাগিল; শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রাদি ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া উঠিল। সতীশ ভায়া কিছু বেশী কাতর হইয়াছেন; অতি মৃদু গতিতেও চলিতে ভায়া যেন অপারগ। পথের ধারে বিশ্রামের উপযোগী স্থান, এমন কি একটি গাছপালা পর্য্যন্ত নাই, যে তাহার ছায়ায় বসিয়া কিছুক্ষণ আরাম করা যায়। রাস্তা খারাপ নহে; প্রশস্ত ও বাঁধা। নিজাম বাহাদুরের পব্লিক ওয়ার্কস্ বিভাগের অধীন। রাস্তার বামদিকে উন্নত শৈলশিখর, দক্ষিণদিকে প্রায় ৪০ ফিট নিম্ন ইলোরা পর্ব্বতের উতাকা ভূমি। অনন্যোপায় হইয়া পথি মধ্যে এক সেতুর উপবিস্থিত প্রস্তর খণ্ডের উপর ভায়া বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিবার পর কতকটা ক্লান্তি দূর হইল। তখন আস্তে আস্তে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করা গেল। দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, আমাদের টাঙ্গার নিকট যাইয়া পৌছিলাম। টাঙ্গাওয়ালা আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আমরা পৌছিয়া টাঙ্গায় আরোহণ করিবা মাত্র টাঙ্গা ছাড়িয়া দিল। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে দৌলতাবাদ ষ্টেসনে আসিয়া পৌছিলাম।

ইলোরা যাত্রাকালে দৌউলতাবাদ ষ্টেশনে আমাদের মাল

আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম সমস্ত প্রস্তুত। দৌলতাবাদ হইতে ইলোরা যাতায়াতের টাঙ্গা ভাড়া যাইবার সময় চুক্তি হইয়াছিল। বিনাবাক্যব্যয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে তাহার ভাড়া দিয়া বিদায় করিলাম। বিশ্রামাগারে দশ পনের মিনিটকাল আরাম করিয়া স্নান করাগেল। সতীশ ভায়া পূরা মাত্রায় করিলেন; আমার অর্দ্ধমাত্রায় হইল। ভ্রমণের কয়েকদিন ক্ষুধার মাত্রাটা যেন কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে বোধ হইল। স্নানান্তে তৃপ্তির সহিত ভোজনকার্য্য সমাধা হইল। এইবার নিদ্রার পর্ব্ব। এ পর্ব্বে আমার অভিনয় নাই। এটা সতীশ ভায়ার একচেটে নিজস্ব সম্পত্তি। ভায়া আহার সমাধান্তে মহুর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া বিশ্রামাগারস্থ একখানি পালঙ্গের উপর শয্যা বিস্তার করিয়া নিদ্রাভিনয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। ভায়ার প্রত্যহ মধ্যাহ্নভোজনের পর এই সময়টা বড় মূল্যবান। নিদ্রাদেবীকে এ সময়টা একবারে মৌরুশী পাট্টা দিয়া রাখিয়াছেন। এই সময়টুকুর উপর ভায়ার কোনও দাবী দাওয়া নাই। ঘটনাক্রমে কোনও দিন যদি এই কায়েম কানুনের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে ভায়ার সে দিনটা বিষম অস্বস্তিতে কাটে।

ইতিমধ্যে ষ্টেশনমাষ্টার সাহেব আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাষ্টার সাহেব বড় অমায়িক লোক। তিনি আমার সন্নিকটে বসিয়া সৌজন্যতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তখন আমি কেমন একটা অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলাম। যদিও ভদ্রলোকের কথায় সায় দিয়া যাইতেছি, কিন্তু আমার

সেদিকে প্রাণ ও মন ছিল না। আহারের পর পানের অভাব হওয়ায় এই অস্বস্তি। আমার এ অস্বস্তি, সতীশ ভায়ার অস্বস্তি অপেক্ষা কিছু কম বলিবার যো নাই; বরং বেশি বলা চলে। ভায়া কেবল ঐ অল্প সময়ের জন্য নিদ্রার গোলাম: আমি সব সময়েই পানের গোলাম। সঙ্গে যে পানগুলি ছিল, তাহা ইলোরার পথেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এখন একটীও নাই যে আহারান্তে চর্ব্বন করি। প্রাণ কেমন ছট্‌ফট্ করিতেছে। মাষ্টার সাহেবের গল্পে আমার মন লাগিবে কেমন করিয়া? দুর্ভাগ্য বশতঃ ষ্টেশনের খাবারওয়ালার নিকটও সেদিন পানের অভাব। ষ্টেশনের রেলওয়ে পুলিশের একজন পাহারওয়ালা অনেক চেষ্টার পর এক আনায় আটটী পানের পাতা আনিয়া দিল। তাহার এই ভদ্রতার জন্য আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। খাবার ওয়ালার দ্বারায় পানগুলিতে খিলি প্রস্তুত করাইয়া চর্ব্বন করিলাম। যেন কত আরাম অনুভব করিলাম; শরীরের জড়তা দূর হইয়া গেল। হায়রে বিলাস নেশা!

ইতিমধ্যে সতীশ ভায়া জাগ্রত হইয়াছেন। ভায়ারও যেন কেমন অস্বস্তি ভাব দেখিলাম। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, ভায়ার আজ নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে; আমি ও ষ্টেশন মাষ্টার, ভায়ার পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতে থাকায়. তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে; তাই সুনিদ্রা হয় নাই। দেখছি ভায়ারও আজ চিঁড়ার ফলাহার।

এখান হইতে আমাদিগকে মনমাদ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে

হইবে। ট্রেনের সময় আগতপ্রায় দেখিয়া, টিকিট খরিদ করিতে চলিলাম। এ সময় আবার এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত। এ প্রদেশ নিজাম বাহাদুরের রাজধানী হায়দারাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল স্থানে নিজাম বাহাদুরের নিজের মুদ্রা প্রচলিত। এ দেশে গভর্ণমেণ্টের নোট প্রভৃতি বদলাইতে হইলে তাহার বিনিময়ে নিজাম বাহাদুরের মুদ্রা লইতে হয়। নিজাম বাহাদুরের টাকার নাম ডাব। এক ডাবের মূল্য আমাদের তের আনা। আমাদের দুজনের নিকট সিকি, দুয়ানি, পয়সা ইত্যাদি খুচরা যাহা ছিল তাহা একত্র করিয়া কোনও রকমে মনমাদ পর্য্যন্ত দুইখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট খরিদ করিয়া লইলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে আমরা উঠিয়া বসিলাম। ষ্টেসনস্থ রেলওয়ে পুলিসের জমাদার যত্ন পূর্ব্বক আমাদের জিনিষ পত্র লোক দিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। লোকটী বরাবর আমাদের সাহায্য করিয়াছিল। যদিও ইহা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত, তথাপি আমরা তুষ্ট হইয়া বিদায় কালে কিছু পারিতোষিক না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবার আমরা নিজাম বাহাদুরের রাজ্য ত্যাগ করিব।

এখানে নিজাম বাহাদুরের রাজত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। নিজাম বাহাদুরের রাজধানীকে নিজামস্ ডমিনিয়ান্ বা হায়দারাবাদ বলে। ভারতবর্ষের মধ্যে কয়েকটী দেশীয় রাজত্ব আছে, তন্মধ্যে হায়দারাবাদ ও মহিসুর রাজ্য

প্রধান। নিজাম রাজ্যের আয়তন ৮৯০০০ বর্গ মাইল। রাজত্বের কার্য্য ও শাসন প্রণালী নিজাম বাহাদুরের নিজের অধীনে এবং অতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত। একটী আইন ব্যবস্থাপক সভা আছে। তাহাতে প্রেসিডেণ্ট্, ভাইসপ্রেসিডেণ্ট্ ও কয়েক জন সদস্য আছেন। তাঁহারাই আইনাদির প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়. শাসন বিভাগ। ইহাতে প্রধান মন্ত্রী ও পর পর অনেকগুলি উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারি আছেন। প্রধান মন্ত্রীর মাসিক বেতন দশ হাজার টাকা। তৃতীয়, রাজস্ব বিভাগ। হায়দারাবাদ রাজ্য প্রধানতঃ চারিটী সুবায় বিভক্ত। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া সুবাদার ও তাঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে তহশিলদার প্রভৃতি কর্ম্মচারি অনেকগুলি আছেন। হাইকোর্ট নামে এক প্রধান বিচারালয় আছে। তাহাতে একজন চিফ্জষ্টীস বা প্রধান জজ ও কয়েকজন সবজজ আছেন। অনেক গুলি ছোট বড় মাজিষ্ট্রেটও আছেন। একটী কাজির আদালতও আছে। কিন্তু বিচারককে কাজি না বলিয়া ইদানীং জজই বলা হয়। তারপর, চিকিৎসা বিভাগ। নিজাম রাজ্যে বহুসংখ্যক হাঁসপাতাল এবং একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় আছে। হাঁসপাতাল সমূহের জন্য একজন ডাইরেকটার জেনারেল ও কয়েক জন সিভিলসার্জ্জন এবং অনেক গুলি এসিষ্টাণ্ট্ ও সবএসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন আছেন।

এখানে পুলিষ বিভাগের বন্দোবস্তও বেশ। ২৫০০৲ টাকা বেতনের একজন ইনস্পেক্টর জেনারেল এই বিভাগের মালিক।

পবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগও সুন্দর। নিজাম বাহাদুরের নিজের রেলওয়ে আছে। তাহাকে Nizam's Guaranteed State Ry, বলে।

সৈনিক বিভাগের খরচ ও নিজাম বাহাদুরের বড় কম নহে। শিক্ষা বিভাগেরও বন্দবস্ত অতি উত্তম।

সেকেন্দারাবাদ সহরেই নিজাম বাহাদুরের খাস রাজধানী ও রাজ প্রাসাদ অবস্থিত। জলবায়ু দুই এক স্থান ব্যতীত প্রায় সমগ্র রাজ্যেই স্বাস্থ্যকর।

সন্ধ্যার পর আমরা মনমাদ জংসনে পৌছিলাম। মনমাদ হইতে নাগপুর যাইব স্থির আছে। এই রাত্রেই ৬টা ৩৫মিনিটের সময় কলিকাতাভিমুখীন বোম্বাই ডাক গাড়ীতে মনমাদ ত্যাগ করিলাম। আজ সমস্ত রাত্রি গাড়িতে অবস্থান করিতে হইবে বলিয়া. গাড়িতে উঠিয়া অল্পক্ষণ পরই শয়নের যোগাড় করিতে লাগিলাম। রাত্রির আহারটা মনমাদে শেষ করিয়া লইয়াছি। সেজন্ত আর উৎকণ্ঠা নাই। এখন যাহাতে সুনিদ্রা হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গাড়ী চলিয়া পর দিবস প্রাতে সাড়ে আটটার সময় নাগপুর পৌছিল। নাগপুরের ৯ মাইল পূর্ব্বে কাম্‌টী একটী বড় ষ্টেশন; সেখানেও ডাকগাড়ী থামে। কাম্‌টী হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অনেকগুলি লোকাল ট্রেন যাতায়াত করে। কামটীতে আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন। নাগপুরে আমাদের বিশেষ পরিচিত কেহ না থাকায়

সেখানে না নামিয়া আমরা বরাবর কাম্‌টী যাইয়া নামিলাম। মনমাদ হইতে পূর্ব্বাহ্ণে আমরা তারযোগে কাম্‌টীর বন্ধুকে আমাদের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া রাখিয়াছি। প্রাতে সাড়ে নয়টার সময় আমরা কামটীতে পৌছিলাম। ষ্টেশন হইতে একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া বরাবর বন্ধুবর বাবু রাধাশ্যাম ওয়াই এর বাটীতে যাইয়া উঠিলাম। রাধাশ্যাম বাবু সে সময় বাটীতেই ছিলেন। আমরা পৌছিলে যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে বসাইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা ও বিশ্রামের পর আমাদের স্নান ও আহারের আয়োজন হইল। স্নান ও ভোজন সমাধান্তে সতীশ ভায়ার যথারীতি ক্ষণকাল নিদ্রা উপভোগও হইল। আজ ভায়ার নিদ্রার কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই। তারপর বেলা ২টার সময় বম্বে অভিমুখীন ডাকগাড়ীতে আমরা নাগপুর পরিদর্শন করিতে রওনা হইলাম।

মধ্য প্রদেশের মধ্যে নাগপুর খুব বড় সহর। নাগপুরে মধ্য-প্রদেশ ও বেরারের চিফ্‌ কমিশনারের সদর আফিস। এখানে সরকারি সকল বিভাগের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। নাগপুর সহরের আয়তন চারি বর্গমাইল অপেক্ষাও অধিক। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। আজকাল প্রতিবৎসর প্লেগের মহামারিতে সহরের শ্রী কিছু নষ্ট হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য বস্তু বিশেষ কিছু নাই। আম্বাঝরি নামে এক বৃহৎ সরোবর আছে; ইহার নাম এখানে প্রসিদ্ধ। মহারাজবাগ নামক বাগান মধ্যে সরকারি পশুশালা আছে; তথায় সকল জাতীয়

পশু না থাকিলেও দেখিবার মত বটে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সহরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার প্রাকালে কাম্‌টী প্রত্যাগমন করিলাম। কাম্‌টীতে আমার পূর্ব্বপরিচিত একটী বাঙ্গালী বন্ধু থাকিতেন। সন্ধ্যার পর আমরা উভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম। বন্ধুটী বহুকাল পর সহসা নিজভবনে আমাদিগকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। অনেকটা সময় আমাদের তাঁহার বাটীতে অতিবাহিত হইল। অবশেষে ভদ্রলোক আমাদিগকে উত্তমরূপে জলযোগ না করাইয়া ছাড়িলেন না।

কাম্‌টী গভর্ণমেণ্টের সৈনিকবিভাগের অধিনে শাশিত একটী ছোটখাট সহর; (Cantonment town)। লোক সংখ্যা ৩০।৩২ হাজার। এখানে সরকারি দেশীয় ও বিদেশীয় সৈন্যাবাস আছে। সহরটী কানহান নামক নদীর উপর অবস্থিত। সহরের একদিকেদেশীয় লোকের, অন্যদিকে সাহেবদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। সহরের রাস্তাঘাটগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সকল রাস্তার উপর সাদা কাঁকর দেওয়া। রাস্তাগুলি প্রশস্ত ও তাহাদের উপর কিছুমাত্র আবর্জ্জনা নাই; দুই পার্শ্বে পরে পরে এক একটী বাগান ও তন্মধ্যে বাঙ্গলো। প্রত্যেক বাঙ্গলোর এক একটী নম্বর ও নাম আছে, যথা—Broad view, Sunny Bank ইত্যাদি। বাগানের ফটকের এক পার্শ্বে নাম ও অন্য পার্শ্বে নম্বরলেখা আছে। এখানকার জলবায়ু মন্দ নয়, তবে যা কেবল প্রায় প্রতি বৎসর একবার করিয়া প্লেগের উপদ্রব হইয়া থাকে।

কাম্‌টী হইতে ১৭ মাইল দূরে রামটেক সহর। রামটেক হিন্দুদের পৌরাণিক এক মহাতীর্থস্থান।

---

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

## রামটেক।

রামটেক নাগপুর জেলার অন্তঃভূর্ক্ত একটী তহশীল বা সবডিভিজান। এ প্রদেশে সবডিভিজানের নাম তহশীল। আমাদের বাঙ্গালা প্রদেশের একজন সবডিভিজানাল অফিসার যেমন কোনও সবডিভিজানের মালিক, এখানে তহশীলদারও সেইরূপ। কামটীর সহিত একটী শাখা রেলপথ দ্বারা রামটেক সংলগ্ন।

রামটেকও ছোট আকারের একটী মনোরম সহর। পদ্মপুরাণে সিন্দুরগিরি নামে যে পর্ব্বতের বর্ণনা আছে, তাহা এই রামটেকে অবস্থিত। রামটেক সহর সিন্দুরগিরির একবারে পাদদেশে বহুপূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত। সহর, পর্ব্বতের পশ্চিমদিকের উপত্যকা হইতে আরম্ভ হইয়া সমতলের অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সিন্দুর গিরির পার্শ্বেই এবং প্রায় উহার সহিত সংলগ্ন তপোগিরি পাহাড়। সহরের সমতল হইতে সিন্দুরগিরি ৬০০ শত ফিট উচ্চ। পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশে রাম-সীতা ও লক্ষ্মণের

মন্দির অবস্থিত। বহুদূর, এমন কি শত মাইল হইতেও মন্দিরের শ্বেত কলেবর সূর্য্যালোকে বিভাষিত হইয়া, স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সিন্দুরগিরি পর্ব্বতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার রিপু অসুর হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। অসুরের রক্তস্রোতে পর্ব্বতের অধিকাংশ স্থল প্লাবিত হইয়া লোহিতরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যায়। তদবধি এই পর্ব্বতের নাম সিন্দুর গিরি হইয়াছে। পর্ব্বতের কোনও কোনও স্থানের পাথর সিন্দুরের মত লাল রঙ্গের দেখিতে পাওয়া যায়; সেই পাথর অঙ্গে বা বস্ত্রাদিতে ঘর্ষণ করিলে লাল দাগ হয়, দেখিয়াছি।

পর্ব্বতের উপরে উঠিবার নিমিত্ত তিনদিকে তিনটী সোপানযুক্ত উত্তম পথ আছে। পর্ব্বতের পশ্চিমদিকের পথ রামচন্দ্রের মন্দিরের অব্যবহিত পার্শ্বেই, ও অতি সুন্দরভাবে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। উহার স্থানে স্থানে বিশ্রামের স্থান আছে; এতদ্ব্যতীত, উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত পথটী দুই পার্শ্বস্থ স্বভাবজাত বৃক্ষ পল্লব ও লতাদির দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় রৌদ্রের ক্লেশ এ পথে ভোগ করিতে হয় না। তবে এদিকে পর্ব্বতগাত্র অত্যন্ত কম ঢালু বলিয়া এ পথে নামা উঠা করিতে যা অল্প বিস্তর মেহনত অনুভব হয়; এরূপ মেহনত পর্ব্বোতারোহণে অনিবার্য্য। দক্ষিণ দিকস্থ পথ উত্তমরূপ বাঁধান না হইলেও, বিশেষ ঢালু বলিয়া এদিক দিয়া উঠা নামায় বড় একটা কষ্ট অনুভব হয় না। সাধারণতঃ লোকে এই পথেই যাতায়াত করিয়া থাকে, এবং এইজন্য ইহাকে সদর রাস্তা বলে।

দক্ষিণ দিকের পথে কিয়দ্দূর উঠিয়া বামপার্শ্বে প্রথমে ধূম্রেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রেতাযুগে ভগবান রামচন্দ্রের রাজত্বকালে এক ব্রাহ্মণ কুমারের অকাল মৃত্যু ঘটে। ব্রাহ্মণ, কুপিত হইয়া পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর কারণ, রাজার প্রতি আরোপ করিলেন, এবং রামচন্দ্রের নিকট এ বিষয় জ্ঞাপন করিয়া, অবিলম্বে এই ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ ও প্রতিকার বিধানের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন; অন্যথায় অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন করিলেন। রামচন্দ্র ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। অবশেষে সিন্দূরগিরি পর্ব্বতে শম্বূক নামে এক শূদ্র মহাকঠোর যোগাভ্যাসে নিযুক্ত আছে, অবগত হইলেন। ইহাই ব্রাহ্মণ কুমারের অকাল মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া অনতিবিলম্বে রামচন্দ্র তথায় গমন করিলেন এবং ঐ শূদ্রকে শর নিক্ষেপে নিধন করেন। শম্বূক রামচন্দ্রের হস্তে তাহার অপবিত্র দেহের অবসান হওয়ায়, পরম প্রীত হইয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিল, যেন তাহার নাম ঐ স্থানে চিরস্মরনীয় হইয়া থাকে। রামচন্দ্রও দয়াপরবশ হইয়া তথাস্তু করিলেন এবং সেইস্থানে ধূম্রেশ্বর মহাদেব নামে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া দিলেন। রামটেক সহরের দিকে পাহাড়ের পাদদেশে আন্দাজ ১৫ গজ লম্বা ও ৬ গজ চওড়া একস্থান কাষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া রামচন্দ্র শম্বূকের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। সময়ে সময়ে ধূম্রেশ্বরের মন্দিরের উপরিস্থ দণ্ডায়মান লৌহ শলকা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাই শম্বূকের স্মরণ চিহ্ন বলিয়া

কথিত। ধূম্রেশ্বরের মন্দিরের অত্যল্পদূর উপরদিকে আর এক মন্দির আছে; তাহার মধ্যে নরসিংহের একবিশাল ভয়াবহ মূর্ত্তি বিগুমান আছে। এই মূর্ত্তি দর্শন করিলে সহসা চমকিত হইয়া উঠিতে হয়। অত্যধিক সিন্দুর লেপনে মূর্ত্তিটী রক্তবর্ণে এরূপ ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়াছে, যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়।

নরসিংহ মন্দিরের সন্নিকটে কিঞ্চিৎ উপরদিকে অগ্রসর হইয়া যাইলে সম্মুখে শ্বেত প্রস্তরের এক প্রকাণ্ড বরাহ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে দৃষ্ট হয়। উহার উদরের নিম্ন দিয়া তীর্থযাত্রীগণকে পার হইয়া যাইতে হয়। জনশ্রুতি এরূপ, কাহারও শরীর যদি পার হইবার সময় বাধা প্রাপ্ত হয় তাহাহইলে সে মহাপাপী বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

বরাহ মূর্ত্তি হইতে কিয়দ্দূর পরে রামচন্দ্রের দেবালয়ের চক আরম্ভ হইয়াছে; এবং এখান হইতে সিন্দূরগিরির উত্তর সীমান্ত পর্য্যন্ত পাহাড় ক্রমোন্নত হইয়া গিয়াছে। এই স্থানের দৈর্ঘ অন্যূন আধ মাইল হইবে। সমগ্র দেবালয়চকের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, এবং পৃথক পৃথক তিনটী খণ্ডে বিভক্ত। প্রথমে সিংপুর ফটক নামে কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুদৃঢ় কপাট সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড ফটক আছে। এই ফটকের অভ্যন্তরে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা বাঁধা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। এ স্থানে পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদিগের সৈনিক বিভাগীয় সরঞ্জমাদি থাকিত। এখনও দুই একটী কামান তথায় পড়িয়া আছে। এই প্রাঙ্গণের পর ভৈরব দরজা নামে লৌহ অর্গল সংযুক্ত কাষ্ঠ নির্ম্মিত অধিকতরদৃঢ় ঐরূপ এক বিরাট দরজা।

এই দরজার পর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শে মন্দিরের প্রহরীগণের আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে ২০ বর্গ হাত আন্দাজ সুগভীর এক পুষ্করিণী আছে; উহার চতুর্দ্দিক প্রস্তরময় সোপান দ্বারা বাঁধা। এরূপ ক্ষুদ্র পুষ্করিণীকে এ দেশে বাউলী বলে। এই প্রাঙ্গণের পর গকুল দরজা। এই দরজার পর মন্দির প্রাঙ্গণ। অহিন্দু বা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের এই দরজার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার নাই। মন্দির প্রাঙ্গণটী স্বল্পবিস্তৃত। ইহার উপর প্রথমে লক্ষণের মন্দির। লক্ষণের মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে রাম সীতার মন্দির। প্রত্যেক মন্দিরের সম্মুখেও মন্দিরের সহিত সংলগ্ন আটটী প্রস্তরময় থামের উপর রক্ষিত ছাদ বিশিষ্ট একটী করিয়া চতুষ্কোণ আট চালা বা নাট্যমন্দির আছে; দর্শকগণ তথায় উপবেশন করিয়া পূজাদি দর্শন করিয়া থাকেন।

রাম সীতা ও লক্ষণের মূর্ত্তি দুইহস্ত পরিমিত উচ্চ উজ্জ্বল কৃষ্ণ মর্ম্মর নির্ম্মিত; নানাবিধ বহু মূল্য বসন ভূষণে সুসজ্জিত। আদিম মূর্ত্তি সকল মুসলমান রাজত্বকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান মূর্ত্তিগুলি পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ "দুধোলা" নামক পুষ্করিণী হইতে আবিষ্কৃত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মন্দির সমূহে প্রত্যহ নিয়মিত পূজা ও আরতি হইয়া থাকে। দেবালয়ের আয় যথেষ্ট আছে। আয় ব্যয় ও পূজা পর্ব্বাদির তত্ত্বাবধারণ জন্য কয়েকজন কর্ম্মচারি নিযুক্তআছেন। প্রধান সেবায়েৎ বা তত্ত্বাবধারক একজন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দিতে এই সকল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

রামচন্দ্রের মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে মন্দিরের সমতলে অন্যূন ৩০ ফুট উচ্চ এবং ১৫ বর্গফুট চতুষ্কোণ মানমন্দিরের আকারের এক মঞ্চ আছে। উহার নাম রামঝরকা। উহার একপার্শ্ব দিয়া উপরে উঠিবার সিড়ি আছে। দর্শকগণ উপরে উঠিয়া চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সমূহের দৃশ্য অবলোকন করিয়া থাকেন। এই মঞ্চের দেওয়ালেও পেনশিলে কত লোকের নাম স্বাক্ষর আছে। এখানেও বাঙ্গালীর নাম অতি অল্প দেখিয়াছি।

রামের মন্দিরের সন্নিকটে পাহাড়ের একটু নিম্নস্তরে এক স্থানে ছোট আকারের এক মন্দিরের মধ্যে ভগবানের বামন মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। এ মন্দিরটী অধিকতর প্রাচীন বলিয়া প্রমান পাওয়া যায়। ৭০০ শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। ইহার নাম বায়ুবাহন মন্দির। আরও একটু নিম্নের দিকে আর একটী ছোট মন্দির আছে। ইহার মধ্যে কলিঙ্কের মুর্ত্তি বিরাজমান আছে। ইহাও অতি প্রাচীন।

সিন্দুরগিরির পূর্ব্বদিকে "আম্বারা" নামে এক অতি বৃহৎ সরোবর আছে। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ তীর সুন্দরভাবে প্রস্তর দিয়া বাঁধান। তীরের উপর চারিদিকে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেবমন্দির আছে। ইহাতে এ স্থানের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'আম্বারা' সম্বন্ধে এক কিম্বদন্তি আছে। পুরাকালে এই স্থানে এক ক্ষুদ্র জলের উৎস ছিল।

আম্বা নামে সূর্য্যবংশীয় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ এক রাজা একদা মৃগয়া উপলক্ষে ঘটনাক্রমে এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজা সে সময় অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর ছিলেন। সম্মুখে জলের উৎস দেখিয়া তাহাতে হস্তপদাদি প্রাক্ষলণ পূর্ব্বক, তাহার জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি দেখেন, তাঁহার শরীরের যে যে স্থানে জল লাগিয়াছিল, সে সকল স্থানের কুষ্ঠের ঘা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। রাজা এই অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, এবং ঐ উৎসকে খনন করাইয়া এক সুগভীর বিস্তীর্ণ সরোবরে পরিণত করিয়া দিলেন। তদবধি এই সরোবর 'আম্বারা' নামে অভিহিত। ইহার জল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র বলিয়া অদ্যাবধি লোকের সংস্কার রহিয়াছে। 'আম্বারার' এই পবিত্রতাহেতু লোকে মৃত ব্যক্তির অস্থি ইহার গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

রামটেকে প্রতি বৎসর কার্ত্তিকমাসের সংক্রান্তিতে ১৫ দিন ব্যাপি এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ সময় নানাস্থান হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। রামটেক ষ্টেসন হইতে রামটেক সহর দুই মাইল পথ। ষ্টেসন হইতে সহর পর্য্যন্ত লোকেলোকারণ্য হইয়া যায়। নানাবিধ পণ্য দ্রব্যের আমদানী হয়। একলক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য বিক্রয় হয়। মন্দিরের আয়, ইহা হইতে বার্ষিক প্রায় দুই হাজার টাকা হইয়া থাকে। রেলওয়ে কোম্পানী প্রতি-বৎসর, মেলার কয়েকদিন নাগপুর হইতে রামটেক পর্য্যন্ত যাত্রীগণের

সুবিধার জন্য ১০।১২ খানি অস্থায়ী ট্রেনের বন্দোবস্ত করেন।

রামটেকে তহশীলদার ও মুন্‌সেফ্‌ কাছারী, ডাক, টেলিগ্রাফ ও মিউনিসিপাল আফিস, পুলিশ থানা, হাসপাতাল, মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়, সাধারণের ক্লাব, বাজার ও ডাকবাঙ্গলো আছে। বাঙ্গালা-দেশ যেমন পাথুরিয় কয়লার খনির কেন্দ্রস্থল, মধ্যপ্রদেশ সেইরূপ "ম্যাঙ্গানিজ" নামক ধাতব পাথরের খনির কেন্দ্রস্থল। রামটেকের সন্নিকটে ম্যাঙ্গানিজের কয়েকটা বড় বড় খনি আছে। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পান সর্ব্বপ্রধান। মধ্য প্রদেশ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে রামটেকের পান প্রসিদ্ধ। এখানে নানাজাতীয় পান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রামটেকের লোকসংখ্যা ১৪।১৫ হাজারের কম নয়। অধিবাসীর মধ্যে পনের আনা মহারাষ্ট্র। জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। আহার্য্য দ্রব্যাদি সমস্ত পাওয়া যায়, ও বঙ্গদেশ অপেক্ষা দুর্ম্মূল্য নয়। সহরের দৃশ্য অতি মনোরম। ছোট খাট সহরটী পাহাড়ের কোলে দূর হইতে যেন একখানি ছবির মত নয়নে প্রতিফলিত হয়। ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছোট বড় কত পাহাড় দেখিয়াছি, কিন্তু স্বভাবের সৌম্য নিকেতন সিন্দুরগিরির মত কোনটীও চক্ষে লাগে নাই। গিরিবর যেন রামটেক সহরটীকে পুত্রের ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, আর মস্তকোপরি রামচন্দ্রের অত্যুচ্চ শুভ্র মন্দির মুকুটের ন্যায় শোভা

পাইতেছে। সহরের সৌন্দর্য্য পাহাড়ের জন্ত, এবং পাহাড়ে
সৌন্দর্য্য উপরিস্থ মন্দির সকলের জন্ত।

সহরের মধ্যে জৈনদের কয়েকটী মন্দির আছে। তন্মধ্যে
শান্তিনাথের মন্দির প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। এ সকল মন্দির অনু
৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত।

ধুম্রেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে আরঙ্গজিবের রাজত্ব সময় এক
মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়, অদ্যাবধি তাহা বর্ত্তমান আছে। এবং সিন্দুর
গিরির পশ্চিমদিকে একটী ছোট পাহাড়ের উপর আর একটী
অপেক্ষাকৃত বড় মসজিদ আছে! এই পাহাড়েরর সহরের দিকে
উপত্যকায় গভর্ণমেণ্টের তহশীল ও অন্যান্য যাবতীয় কার্য্যাল
অবস্থিত।
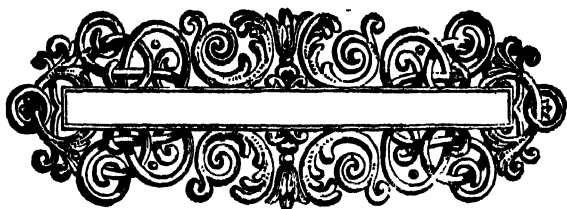
# সপ্তম পরিচ্ছেদ।

## প্রত্যাবর্ত্তন।

কামটী হইতে আমরা বরাবর স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিব স্থির আছে। বিলাসপুরে নামিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোনও কারণে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। সুতরাং পরদিবস রাত্রি ১২৷৷০ টার সময় একস্‌প্রেস ট্রেনে বরাবর পুরুলিয়া রওনা হইলাম। অদ্য রাত্রির অবশিষ্টাংশ, এবং আগামী কল্য সমস্তদিন ও রাত্রি গাড়ীতে অবস্থান করিতে হইবে, সেইজন্য বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া শয়নের যোগাড় করিয়া অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম। পরদিন বেলা ১০টার সময় চক্রধরপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। রাত্রি ২টার সময় চক্রধরপুর হইতে পুরুলিয়াগামী ট্রেনে রওনা হইয়া পরদিন প্রত্যুষে পুরুলিয়া পৌছিয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া পুনর্ম্মিলিত হইলাম, এবং আপন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

সমাপ্ত।